তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা।

সম্বৎ ১৯২৯। কলিগতাব্দ ৪৯৭১। ২৪ চৈত্র শুক্র বার।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য ত্রয়োদশানুবাকে সপ্তমং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ পংক্তিচ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

৮৫৮

১১ ইমে চিত্তব মন্যবে বেপেতে ভিয়সা মহী। যদিন্দ্র বজ্রিন্নোজসা বৃত্রং মরুত্বাঁ অবধীরর্চ্চন্ননু স্বরাজ্যং।

১১ 'মহী' মহত্যৌ 'ইমে চিৎ' দ্যাবাপৃথিব্যাবপি হে ইন্দ্র 'তব' 'মন্যবে' ত্বদীয়কোপাৎ 'ভিয়সা' ভীত্যা 'বেপেতে' কম্পেতে হে 'বজ্রিন্' বজ্রবন্ 'ইন্দ্র' 'মরুত্বান্' মরুদ্ভির্যুক্তঃ ত্বং 'ওজসা' বলেন 'যৎ' যদা 'বৃত্রং' 'অবধীঃ'। তদা দ্যাবাপৃথিব্যাবপি ভয়েনাকম্পিষাতাং ইত্যর্থঃ।

১১ হে বজ্রধর ইন্দ্র! যখন তুমি স্বাধিপত্য প্রকটিত করিয়া বলপূর্ব্বক বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলে, তখন এই বৃহৎ স্বর্গ মর্ত্ত্যও তোমার কোপ-ভয়ে কম্পিত হইয়াছিল।

৮৫৯

১২ ন বেপসা ন তন্যতেন্দ্রং বৃত্রো বি বীভয়ৎ। অভ্যেনং বজ্র আয়সঃ সহস্রভৃষ্টিরায়তার্চ্চন্ননু স্বরাজ্যং।

১২ 'বৃত্রঃ' 'ইন্দ্রং' 'বেপসা' স্বকীয়েন কম্পনেন 'ন' 'বিবীভয়ৎ' ভীতং নাকরোৎ। তথা 'তন্যতা' স্বকীয়েন ঘোরেণ গর্জ্জনশব্দেন 'ন' বিবীভয়ৎ। অপিচ ইন্দ্রেণ নিসৃষ্টঃ 'আয়সঃ' অয়োময়ঃ 'সহস্রভৃষ্টিঃ' অনেকাভির্ধারাভির্যুক্তঃ 'বজ্রঃ' 'এনং' বৃত্রং 'অভি' 'আয়ত' হন্তুমাভিমুখ্যেনাগচ্ছৎ। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।

১২ বৃত্রাসুর কম্পন বা গর্জ্জন দ্বারা ইন্দ্রকে ভীত করিতে পারে নাই; প্রত্যুত ইন্দ্র স্বাধিপত্য প্রকটন পূর্ব্বক যে লৌহময় সহস্রধার বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা বৃত্রাসুরের অভিমুখে উপস্থিত হইয়াছিল।

৮৬০

১৩ যদ্বৃত্রং তব চাশনিং বজ্রেণ সময়োধয়ঃ। অহিমিন্দ্র জিঘাংসতো দিবি তে বদ্বধে শবোর্চ্চন্ননু স্বরাজ্যং।

১৩ হে 'ইন্দ্র' 'যৎ' যদা 'বৃত্রং' 'তব' হননার্থং তেন সৃষ্টাং 'অশনিং' 'চ' ত্বং 'বজ্রেণ' 'সময়োধয়ঃ' সম্যক্ প্রাহার্ষীঃ। তদানীং 'অহিং' আগত্য হন্তারং বৃত্রং 'জিঘাংসতঃ' হন্তুমিচ্ছতঃ 'তে' তব 'শবঃ' বলং 'দিবি' 'বদ্বধে' বদ্ধং অনুস্যূতং ব্যাপ্তমাসীৎ। শিষ্টং পূর্ব্ববৎ।

১৩ হে ইন্দ্র! যখন তুমি স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটন পূর্ব্বক বৃত্রাসুরকে ও তোমার প্রতি

প্রক্ষিপ্ত তাহার অশনিকে বজ্র দ্বারা প্রহার করিয়াছিলে, তখন নির্ঘাতনার্থ সমাগত সেই বৃত্রকে হননেচ্ছায় তোমার বল আকাশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল

৮৬১

১৪ অভিষ্টনে তে অদ্রিবো যৎস্থা জগচ্চ রেজতে। ত্বষ্টা চিত্তব মন্যব ইন্দ্র বেবিজ্যতে ভিয়ার্চ্চন্নমু স্বরাজ্যং।

১৪ হে 'অদ্রিবঃ' বজ্রবন্নিন্দ্র 'তে' তব 'অভিষ্টনে' সিংহনাদে সতি 'স্থাঃ' স্থাবরং 'জগৎ' জঙ্গমং 'চ' 'যৎ' অস্তি তদুভযং 'রেজতে' কম্পাতে। 'ত্বষ্টা চিৎ' বজ্রনির্ম্মাতা ত্বষ্টা চ 'তব মন্যবে' ত্বদীযায কোপায 'ভিযা' ভীত্যা 'বেবিজ্যতে' ভৃশং কম্পতে। অন্যৎ সমানং।

১৪ হে বজ্রধর ইন্দ্র! তোমার সিংহনাদে স্থাবর জঙ্গম কম্পিত হয়। বজ্রনির্ম্মাতা বিশ্বকর্ম্মাও তোমার কোপ-ভয়ে পুনঃপুন কম্পিত হন। তুমি এই রূপে স্বীয় স্বাধিপত্য বিস্তার করিতেছ।

৮৬২

১৫ নহি নু যাদধীমসীন্দ্রং কো বীর্য্যা পরঃ। তস্মিন্নৃম্নমুত ক্রতুং দেবা ওজাংসি সংদধুরর্চ্চন্নমু স্বরাজ্যং।

১৫ 'যাৎ' যান্তং সর্ব্বত্র ব্যাপ্য বর্ত্তমানং 'ইন্দ্রং' 'নহি' 'নু' 'অধীমসি' বযং নহ্যবগচ্ছামঃ। যতোবযমল্পাঃ। 'পরঃ' ইত্যেতৎ সকারান্তমব্যযং বৈদূর্য্যমাচষ্টে পরোদিবা পরএনেতি যথা। পরঃ পরস্তাদতিদূরে মনুষ্যৈরনবগাহ্যে স্থানে 'বীর্য্যা' বীর্য্যেণ সামর্থ্যেন বর্ত্তমানমিন্দ্রং 'কঃ' মনুষ্যঃ জানীযাৎ ন কোঽপীত্যর্থঃ। কস্মাদিতিচেৎ। তত্রাহ তস্মিন্নিতি। যস্মাৎ 'তস্মিন্' ইন্দ্রে 'দেবাঃ' 'নৃম্নং' ধনং 'উত' অপিচ 'ক্রতুং' বীর্য্যং কর্ম্ম 'ওজাংসি' বলানি চ 'সংদধুঃ' স্থাপযাঞ্চক্রুঃ। তস্মাদিত্যর্থঃ।

১৫ সর্ব্বত্রগামী ইন্দ্রকে আমরা অবগত নহি। অতি দূরে বর্ত্তমান ইন্দ্রের সামর্থ্য কোন মনুষ্যই জানিতে পারে না; যে হেতু দেবতারা ইন্দ্রেতে ধন, বীর্য্য ও বল স্থাপন করিয়াছেন। ইন্দ্র স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন।

৮৬৩

১৬ যামথর্ব্বা মনুষ্পিতা দধ্যঙ্ ধিয়মত্নত। তস্মিন্ ব্রহ্মাণি পূর্ব্বথেন্দ্র উকথা সমগ্মতার্চ্চন্নমু স্বরাজ্যং। ১। ৫। ৩১।

১৬ 'অথর্ব্বা' এতৎসংজ্ঞকঋষিঃ 'পিতা' সর্ব্বাসাং প্রজানাং পিতৃভূতঃ 'মনুঃ' চ 'দধ্যঙ্' অথর্ব্বণঃ পুত্রঃ এতৎসংজ্ঞকঃ ঋষিশ্চ 'যাং' 'ধিযং অত্নত' যং কর্ম্মাতন্বত অকুর্ব্বন্। 'তস্মিন্' কর্ম্মণি যানি 'ব্রহ্মাণি' হবির্লক্ষণানি অন্নানি 'উকথা' শস্ত্ররূপাণি স্তোত্রাণি চ যানি সন্তি তানি সর্ব্বাণি তস্মিন্ 'ইন্দ্রে' 'সমগ্মত' সমগচ্ছন্ত। তত্র দৃষ্টান্তঃ। 'পূর্ব্বথা' পূর্ব্বেষামন্যেষাং বশিষ্ঠাদীনাং যজ্ঞেষু যথা হবীংষি স্তোত্ররূপাণি চেন্দ্রেণ সংগচ্ছন্তে তদ্বৎ। যঃ ইন্দ্রঃ 'রাজ্যং' স্বস্য রাজত্বং 'অনু' 'অর্চ্চন্' অনু পূজয়ন্ বৃত্রবধাদিরূপেণ কর্ম্মণা স্বকীয়মধিপতিত্বং প্রকটযন্নিত্যর্থঃ। ১। ৫। ৩১।

১৬ ইন্দ্র পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিদিগের যজ্ঞের ন্যায় অথর্ব্ব, সকলের পিতা মনু, ও দধ্যঙ্ নামক ঋষিদিগের যজ্ঞীয় অন্ন ও স্তোত্র সকল গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ইন্দ্র বৃত্র বধাদি দ্বারা স্বকীয় আধিপত্য প্রকটিত করিতেছেন। ১। ৫। ৩১।

পঞ্চমোধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

মেদিনীপুরে গোপগিরিতে বসন্ত কালে ব্রহ্মোপাসনা।

বসন্ত ঋতু উপস্থিত, প্রাতঃ-সূর্য্য সমুদিত, গোপগিরি প্রফুল্লিত। আমরা এই শুভ ক্ষণে এক কালে নূতন ঋতু, নূতন দিবস, শরীর ও মনের নূতন বীর্য্য, লাভ করিয়াছি। সকলই অভিনব; আমারদের ভক্তি-পুষ্প অভিনব রূপ ধারণ পূর্ব্বক সেই মঙ্গলময়ের চরণে কি অর্পিত হইবে না? বন উপবন, গিরি কানন, স্রোতঃস্বতী, তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে; পক্ষিগণ বৃক্ষ-শাখায় আরূঢ় হইয়া তাঁহার গুণ গান করিতেছে; মলয় সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া তাঁহার যশ প্রচার করিতেছে; স্বয়ং বসন্ত গন্ধ পুষ্প

হস্তে লইয়া তাঁহার পূজার জন্য অগ্রসর হইয়াছে; আমরাই কি কেবল তাঁহার উপাসনা হইতে বিরত থাকিব? তিনিই এই নব ঋতু, নব পত্র, নব নব কলিকা প্রেরণ করিতেছেন। যিনি ব্যাধিকে আরোগ্যে, বিপদ্‌কে সম্পদে, পরাজয়কে জয়ে পরিণত করেন; তিনিই বসন্তের প্রকাশ করেন। যিনি শীতকে বসন্তে, ব্যাধি আরোগ্যে, বিপদ্ সম্পদে, পরাজয় জয়ে, পরিণত করেন; তিনি কি মৃত্যুকে অমৃতেতে পরিণত করিতে পারেন না? সেই পারলৌকিক জীবন, বসন্তের ন্যায় আমারদিগের সম্বন্ধে স্ফুরিত হইবে; বাহ্য সূর্য্য আমারদিগের সম্মুখে এ ক্ষণে যে রূপ দীপ্তি পাইতেছে, তাহা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর রূপে প্রেম-সূর্য্য পর লোকে আমারদের সম্মুখে দীপ্তি পাইবেক। যে মঙ্গলময় পিতা আমারদিগকে ইহ কালে ধর্ম্মাচরণের সুখের পর আবার পর লোকে এ রূপ আনন্দ প্রদান করিবেন, তাঁহার উপাসনাতে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাক। তাঁহাকে প্রীতি কর, তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন কর; তাহা হইলে বসন্তের কুসুম অপেক্ষা তোমারদের হৃদয় মধুময় হইবে, বসন্তের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সৌন্দর্য্য তোমারদের মুখশ্রীতে প্রকাশিত হইবে, মলয়-সমীরণ অপেক্ষা প্রফুল্লকর আত্ম-প্রসাদের হিল্লোল তোমারদের অন্তরে নিত্য সঞ্চরণ করিবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

৬ চৈত্র ১৭৮৭ শক।

প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

যিনি চন্দ্র-তারকে থাকিয়া—চন্দ্র-তারকের অন্তরে থাকিয়া চন্দ্র-তারককে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই আমারদের আত্মাতে থাকিয়া—আত্মার অন্তরে থাকিয়া জ্ঞান ধর্ম্মে তাহাকে পরিপুষ্ট ও উন্নত করিতেছেন। তিনি আকাশে, তিনি আত্মাতে। তিনি বাহিরে, তিনি অন্তরে। তিনি সর্ব্ব-সাক্ষী, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষ। তিনিই আমারদের আরাধ্য দেবতা। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য দূরে যাইতে হয় না, দেশ বিদেশে অনুসন্ধান করিতে হয় না—তাঁহার প্রিয় আবাস-স্থান এই পবিত্র আত্মা। যিনি আপনার আত্মাকে পবিত্র করেন, তিনি তাঁহাকে অন্তরে দেখিতে পান। আকাশে রূপ নাই; আকাশকে চক্ষে দেখা যায় না, আকাশকে হস্তে ধরিতে পারি না—তথাপি আমার সম্মুখে এই সুবিস্তৃত অসীম আকাশকে আমি সুস্পষ্ট অনুভব করিতেছি। এই শূন্য আকাশকে আমরা যে রূপ অনুভব করিতেছি, পূর্ণ ঈশ্বরকেও সে রূপ অনুভব করি না—আমারদের এ কি মোহ! আকাশ শূন্য পদার্থ—ঈশ্বর অনাকাশ, তিনি আকাশ নহেন, তিনি শূন্য নহেন; কিন্তু তিনি পূর্ণ, তিনি সত্য। আকাশ তাঁহার সত্তাতে—সেই সত্যের সত্তাতে পূর্ণ রহিয়াছে। তথাপি শূন্য আকাশকে আমরা যে রূপ অনুভব করিতেছি, পূর্ণ ঈশ্বরকে সে রূপ অনুভব করি না। যিনি এই আকাশে রহিয়াছেন; তিনি আবার যেখানে আকাশ নাই, সেখানেও রহিয়াছেন। আকাশ নাই কোথায়? আকাশ নাই আত্মাতে। আপনার শরীরের মধ্যে অশরীর আত্মাকে দেখ, দেখিবে যে সেখানে আকাশ নাই। আত্মাতে আকাশ নাই—আত্মা আকাশের অতীত পদার্থ। আত্মা স্থূল নহে, অণু নহে, হ্রস্ব নহে, দীর্ঘ নহে; এই আত্মার মধ্যেই অনাকাশ স্বপ্রকাশ পরমাত্মা অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি বাহিরে এই সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত

রহিয়াছেন; এবং যেখানে এই আকাশ নাই, সেখানেও রহিয়াছেন। এই চর্ম্ম-চক্ষু দ্বারা দেখিতে গেলে তাঁহাকে দূর হইতেও দূরে মনে হইবে, অন্তশ্চক্ষু দ্বারা স্বীয় আত্মাতেই তাঁহার উপলব্ধি হইবে। সেই একোবশী পরমেশ্বরের শাসনে আকাশে রবি শশী, আত্মাতে দয়া ধর্ম্ম, নিয়মিত হইতেছে। সেই একোবশী পরমেশ্বরেরই শাসনে মনুষ্য তাঁহার ধর্ম্ম-সেতু লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত, ভীত, লজ্জিত হয়—লঙ্ঘন করিলে গ্লানিতে শোকেতে তাহার হৃদয় শতধা ভিন্ন হইয়া যায়, নরকাগ্নিতে তার আপাদ-মস্তক দগ্ধ হইয়া যায়। তাঁহারি নিয়মে পাপী দণ্ড ভোগ করিতেছে, পুণ্যাত্মা পবিত্রতা লাভ করিতেছে। তাঁহারি করুণাতে পশু-সকল এই পৃথিবীর সুখ, পৃথিবীতে ভোগ করিয়া, পৃথিবীতেই লীন হইতেছে; তাঁহারি প্রসাদে আত্মা ধর্ম্ম লইয়া ঈশ্বর লইয়া, অন্য আকাশে অন্য লোকে, উদিত হইতেছে। পরমেশ্বরের শাসনে জড় রাজ্য, ধর্ম্ম রাজ্য, সকলি প্রশাসিত হইতেছে। যিনি এই আকাশের অন্তরাত্মা, যিনি এই আত্মার অন্তরাত্মা, তিনিই আমারদের আরাধ্য দেবতা। হৃদয়কে পবিত্র করিয়া এখানে তাঁর পবিত্র সত্তা উপলব্ধি কর, এখনি তাঁর আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হও। তিনি এখানে উপস্থিত আছেন, তিনি তাঁহার তদ্গত ভক্তদিগের নিকট হইতে পূজা গ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়া রহিয়াছেন। তিনি তাঁর সত্য তাঁহারদের জন্যে এখনি ব্যক্ত করিতেছেন। দেখ, রসনা তাঁহার গুণ বলিয়া ক্ষান্ত হইতেছে না। যত ক্ষণ না প্রতি জনে তাঁহার পবিত্র স্বরূপ উপলব্ধি করিবে, তত ক্ষণ তিনি এই রসনাকে তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবেন। যত ক্ষণ না প্রত্যেকে তাঁহার পবিত্র স্বরূপ উপলব্ধি করিবে, যত ক্ষণ না প্রত্যেকে তাঁহাকে হৃদয়ের পূজা দিতে প্রস্তুত হইবে; তত ক্ষণ তিনি তাঁর সত্য প্রেরণ করিবেন, তত ক্ষণ রসনা হইতে তাঁহার সত্য উৎসারিত হইতে থাকিবে। তিনি এখনি পূজা গ্রহণের নিমিত্তে উপস্থিত আছেন, তাঁর পবিত্র নিঃশ্বাস এখানে সমীরিত হইতেছে, তাঁর এই বহমান-বসন্ত-সমীরণ-স্বরূপ আনন্দ-প্রবাহ অনুভব করিয়া তাঁহাকে পূজা কর। তাঁহার নিকটে অবনত হও। তিনি অনন্ত দেব, মঙ্গলময়, মহান্; তিনি আমারদের পিতা মাতা বলিয়া আমারদের নিকটে প্রীতি চান, পূজা চান; আমরা কি এ প্রকার অধম ও কঠোর যে তাহাও তাঁহাকে দিতে পারিব না। জড়তা দীর্ঘ-সূত্রতা পরিত্যাগ কর—ঈশ্বরের চরণে প্রণত হও। কি আশ্চর্য্য! বলিতে বলিতে যে এখানে সকলেই স্তব্ধ হইয়া আনন্দ-পুলকে তাঁহার মধুময় ভাব অবলোকন করিতেছেন, দেখিতেছি। এ কি আশ্চর্য্য মনোহর দৃশ্য; হে হৃদয়েশ্বর! আমারদের প্রীতি-পূজা গ্রহণ কর। তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

তত্ত্ববিদ্যা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার সার সঙ্কলন করিয়া এই একটি অপূর্ব্ব সন্ধান পাওয়া যায় যে মূল-তত্ত্ব-সকলকে প্রজ্ঞাতেই অন্বেষণ করিতে হইবে। প্রজ্ঞার প্রকৃত ভাব স্পষ্ট-রূপে অবগত হইতে হইলে, ইন্দ্রিয়-বোধ এবং বুদ্ধি—এ দুয়ের সহিত উহার প্রভেদ অবধারণ করা আবশ্যক; অতএব ইন্দ্রিয়-বোধ ও বুদ্ধি—এ দুই ক্রিয়া উপলক্ষ্যে

প্রধান প্রধান কয়েকটি তথ্য অগ্রে পরিস্ফুট করিয়া পশ্চাত্তে প্রজ্ঞা-সম্বন্ধীয় গুরুতর বিষয়-সকলের প্রতি বিশেষ-রূপে মনো-নিবেশ করা যাইতেছে।

রূপ দর্শন, রসাস্বাদন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বোধ ব্যতীত আমরা কোন বিষয়কেই প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ নহি। এই সকল ইন্দ্রিয়-বোধ কোথা হইতে আসিতেছে? আমারদের অন্তরে—যেখানে আমরা জীবাত্মাকে উপলব্ধি করি—সেখান হইতে নহে; এবং তাহারও অভ্যন্তরে—যেখানে আমরা সকল আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করি—সেখান হইতেও নহে; কিন্তু বাহিরের ভৌতিক বস্তু-সকল হইতেই উহারা সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হইতেছে। ভৌতিক বস্তু-সকলকেই আমরা রূপ রস প্রভৃতির আধার বলিয়া নিশ্চয় করিয়া থাকি। একটা আম্র ফল, যাহাকে আমরা চক্ষুতে দর্শন করিতেছি, তাহাকেই আমরা আবার জিহ্বাতে আস্বাদন করিতেছি—এ স্থলে দৃষ্টি করিবার শক্তি এবং আস্বাদন করিবার শক্তি যেমন একই আত্মার শক্তি; সেই রূপ দৃষ্ট হইবার শক্তি এবং আস্বাদিত হইবার শক্তি একই ভৌতিক বস্তুর শক্তি; একই ভৌতিক বস্তু আমাদের দৃষ্টি এবং আস্বাদন উভয়কেই উত্তেজনা করিতেছে। যখন আমারদের ইন্দ্রিয়-বিশেষে বোধ-বিশেষের আবির্ভাব হয়, তখন আপনা হইতেই এই এক প্রত্যয় আইসে, যে উক্ত বোধোদয়ের কোন না কোন কারণ অবশ্যই আছে; এবং সেই কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে উক্ত বোধ আমারদের স্বকীয় ইচ্ছা-সহকারে উদিত হয় নাই; অতএব আমারদের স্বাধীন আত্মা উহার কারণ নহে, অন্য কোন পদার্থই উহার কারণ হইবে।

বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়-বোধের সাক্ষাৎ কারণ যদি আমরা আপনারা না হইলাম, তবে কি স্বয়ং ঈশ্বর উহার সাক্ষাৎ কারণ? ঈশ্বরকে যখন আমরা বলি যে তিনি সমুদায়েরই মূল কারণ, তখন তাহাতে ইহাই বলা হয় যে যদিও ঘটনা-বিশেষের সাক্ষাৎ কারণ তাঁহারই ইচ্ছাতে নিযুক্ত রহিয়াছে, তথাপি তিনি স্বয়ং তাহা নহেন; অতএব বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়-বোধের সাক্ষাৎ কারণ ভৌতিক বস্তু ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

ইন্দ্রিয়-বোধে আমারদের আপন কর্তৃত্বের অভাব উপলব্ধি হয় বলিয়াই আমরা উহার কারণ বাহিরে নির্দ্দেশ করিতে কাযে কাযে বাধ্য হই; কিন্তু যে কোন ক্রিয়া আমারদের আপন কর্তৃত্বে সাধিত হয়, তাহার যে আমরা আপনারাই কারণ, ইহা বলা পুনরুক্তি মাত্র। আমরা যদি পশুদিগের ন্যায় রূপ দর্শন, শব্দ শ্রবণ, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-মূলক অবস্থা-বিশেষ বোধ মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতাম; তাহা হইলে আমরা আপনাকে কখনো দ্রষ্টা এবং শ্রোতা রূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতাম না। যদি এ রূপ হইত যে যখনি আমারদের চক্ষুতে আলোক নিপতিত হয়, তখনি পতঙ্গবৎ মূঢ়-ভাবে আমারদের মন তাহার প্রতি আসক্ত হয়; যখনি শ্রবণে শব্দ প্রতিহত হয়, তখনি মন তাহার প্রতি ধাবিত হয়; এবং তৎ তৎ সময়ে অথবা অন্য কোন সময়ে আমরা স্বাধীন-রূপে কোন কিছুতে মনো-নিবেশ করিতে সমর্থ না হই; তাহা হইলে বর্ণ দর্শন, শব্দ শ্রবণ প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন ঘটনা-সকলের মধ্যে আমরা এ রূপ কোন যোগ নিবদ্ধ করিতে পারিতাম না, যাহাতে আমারদের আপন কর্তৃত্ব বোধ-গম্য হইতে পারিত এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মাকে উপলব্ধি হইত।

কিন্তু ঈশ্বরের অপর্য্যাপ্ত মঙ্গল-ভাব মনুষ্যকে কেবল ইন্দ্রিয়-বৃত্তি দিয়াই ক্ষান্ত নহে; বুদ্ধি-রূপ আর এক উৎকৃষ্টতর বৃত্তি দিয়া উহার সমক্ষে উন্নতির গগন-ভেদী সোপান-পরম্পরা অনাবৃত করিয়া দিয়াছেন। এই বুদ্ধিই আমারদিগের কর্ত্তৃত্বের নিদানভূত—কেবল হস্ত পদ চালনাতেই কর্ত্তৃত্ব হয় না; বুদ্ধি পূর্ব্বক আমরা যে কোন কার্য্য করি, তাহাতেই আমাদের কর্ত্তৃত্ব।

আমরা যখন বস্তু-বিশেষকে প্রত্যক্ষ করি, তখন সঙ্গে সঙ্গে এই এক শক্তি অন্তরে অনুভব করি যে ইহার সমান অন্য অন্য বস্তুকে আমরা প্রত্যক্ষ অথবা কল্পনা করিলেও করিতে পারি; সুতরাং প্রত্যক্ষ-ক্রিয়াতে আমারদের মন উপস্থিত বিষয়েতেই সর্ব্ব সমেত আবদ্ধ থাকে না; পরন্তু উহা উপস্থিত বিষয়ের দিকে সমধিক আকৃষ্ট হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে আমারদের আপন বশে থাকে, তাহাতে আর সংশয় নাই; এই হেতু আমরা স্বীয় চেষ্টা দ্বারা আমারদের মনকে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে অনায়াসে নিয়োগ করিতে পারি। আমরা যখন সম্যক্ জ্ঞাতসারে এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে মনো-নিবেশ করি; তখন উজ্‌ঝিত বিষয় আমারদের স্মরণে থাকে, উপস্থিত বিষয় আমাদের সংজ্ঞাতে প্রত্যক্ষ হয়, এবং দুয়ের যোগ কল্পনাতে সাধিত হয়। আমরা চেতন-সহকারে প্রথমে একটা অশ্বকে প্রত্যক্ষ করিলাম, পরে একটা গোকে প্রত্যক্ষ করিলাম; গোকে যখন সংজ্ঞাতে প্রত্যক্ষ করিতেছি, তখন অশ্ব আমারদের স্মরণে আছে; এবং যখন গো এবং অশ্ব উভয়কেই পশু-রূপ এক শ্রেণীতে নিক্ষিপ্ত করিতেছি, তখন ইতি পূর্ব্বে উহারা অবশ্যই কল্পনা কর্ত্তৃক যোগবদ্ধ হইয়াছে। পশু শব্দ বলাতে আপাততঃ কোন বিশেষ পশুকে বুঝায় না, কিন্তু সাধারণ রূপে সকল পশুকেই বুঝায়; সুতরাং গো বা অশ্ব বিশেষকে পশু বলিয়া নিশ্চয় করিলে বিশেষ বিশেষ বিষয়কে একটি সাধারণ তথ্যের অন্তর্গত করা হয়—এই রূপ ক্রিয়াকেই বুদ্ধি কহে। সম্যক্ চেতন-সহকারে অশ্বকে স্মরণে রাখিয়া গোকে প্রত্যক্ষ করাতে, বা গোকে স্মরণে রাখিয়া অশ্বকে প্রত্যক্ষ করাতে—বিশেষতঃ পশু-রূপ উভয়ের সামঞ্জস্য-ভাব স্মরণে রাখিয়া উহারদের কোনটির প্রতি মনো-নিবেশ করাতে এবং এই রূপ সাধারণ হইতে বিশেষ বিশেষে অবতীর্ণ হওয়াতে—আমারদের আপনাদেরই কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পায়। এই হেতু ইন্দ্রিয়-বোধের সাক্ষাৎ কারণ যে রূপ ভৌতিক বস্তু, বুদ্ধি-ক্রিয়ার সাক্ষাৎ কারণ সেই রূপ আমরা আপনারা। বিষয়-বিশেষকে সজ্ঞান ভাবে প্রত্যক্ষ করাতেই বুদ্ধির প্রথম সূত্রপাত। আমরা যখন একটা অশ্বকে প্রত্যক্ষ করি; তখন যাহা অশ্ব নহে, এমন সকল সামগ্রী হইতে উহাকে বিশেষ করিয়াই উহার প্রতি মনঃ সংযোগ করি। এ স্থলে জানা আবশ্যক যে যেমন পুত্র বলাতে পিতার সহিত উহার সম্বন্ধ বুঝায়, অনেক বলাতে একের সহিত উহার সম্বন্ধ বুঝায়; সেই রূপ বিশেষ বলাতে সাধারণের সহিত উহার সম্বন্ধ বুঝায়। পিতা পুত্র, এক অনেক, সাধারণ বিশেষ; ইত্যাদি যুগল-গণের একটিকে যেখানে ব্যক্ত করা হয়, অন্যটি সেখানে কাজে কাজেই উহ্য থাকে। অতএব আমরা যখন একটা অশ্বকে অন্য অন্য সামগ্রী হইতে বিশেষ করিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি, তখন অশ্ব এবং উক্ত অন্য অন্য সামগ্রী সম্বন্ধে সাধারণ কোন কিছু অবশ্যই আছে—অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে বিশেষ

বিশেষ প্রত্যক্ষ-বিষয়ের সম্বন্ধে যাহা সাধারণ, তাহা আমারদের স্বস্ব চেতন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। একই চেতন কর্ত্তৃক অশ্ব, গো, হস্তী প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়-সকল প্রত্যক্ষ হয়; বিশেষ বিশেষ প্রত্যক্ষ-বিষয় বলিয়া মাত্র একই চেতন পদার্থ উহারদের সাধারণ প্রত্যক্ষ-কর্ত্তা রূপে আপনা হইতেই প্রতীয়মান হয়। অশ্ব-বিশেষকে পশু বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার এই মাত্র অর্থ যে অশ্ব গো, হস্তী. ইহারা সকলে সাধারণ-রূপে একই চেতনের বিষয়। এই রূপ সাধারণ চেতনকে মনোযোগ দ্বারা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে নিযুক্ত করাতে বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব প্রকাশিত হয়; এবং বুদ্ধির দ্বারা বস্তু-সকলকে বিশেষ বিশেষ করিয়া জানিবার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতা রূপে আপনাকে উপলব্ধি করা অগত্যাই ঘটিয়া উঠে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে ইন্দ্রিয়-বোধ অনুসরণ করিয়া আমরা যে রূপ ভৌতিক বস্তুতে উপনীত হই, সেই রূপ বুদ্ধি-ক্রিয়া অনুসরণ করিয়া আমরা আপন আত্মাতে উত্তীর্ণ হই।

পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়-বোধ-সকলের আধার বহির্ব্বস্তু, এ ক্ষণে পাওয়া গেল যে বুদ্ধি-ক্রিয়ার আধার আমারদের আত্মা; অতঃপর প্রজ্ঞার আধার কে তাহাই অন্বেষণ করা যাইতেছে। পূর্ব্ব অধ্যায়ে যথা-সাধ্য নিরূপণ করা হইয়াছে যে অবশ্যম্ভাবী ও সার্ব্বভৌমিক মূল-তত্ত্ব-সকলই প্রজ্ঞার সম্বল; এ ক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে এ সকল মূল তত্ত্ব কোথা হইতে আসিতেছে? উহারা ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে, সুতরাং উহারা বাহির হইতে আসিতেছে না; উহারা বুদ্ধি কর্ত্তৃক পরীক্ষা-পরম্পরা হইতে সংগৃহীত নহে, সুতরাং উহারা আমারদের স্বীয় কর্ত্তৃত্ব হইতে আসিতেছে না—প্রত্যুত উহারা পূর্ব্ব হইতে আমারদের আত্মাতে আছে বলিয়াই এত কাল আমরা বুদ্ধি-বৃত্তি-সকলকে চালনা করিতে পারিয়াছি ও ভৌতিক বস্তু-সকলকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছি। দেশ অসীম, কাল অসীম, আমি এক, ঘটনা মাত্রেরই কারণ আছে, ইত্যাদি তত্ত্ব গুলিকে যদি বুদ্ধি খাটাইয়া পরীক্ষা সহকারে জানিতে হইত; তাহা হইলে আমরা কোন কালেই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতাম না। দেশ অসীম—ইহা আমরা পূর্ব্ব হইতে জানি বলিয়া অগণ্য অগণ্য নক্ষত্রকে অবলীলা ক্রমে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি; কাল অসীম—ইহা আমরা পূর্ব্বাবধি জানিতেছি বলিয়া শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর যেরূপ অবস্থা ছিল, অদ্য তাহা অম্লান বদনে পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি; আমি এক—ইহা আমরা পূর্ব্বাবধি জানিতেছি বলিয়া পরীক্ষা দ্বারা শত শত ঘটনাকে এক বন্ধনে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হইতেছি; ঘটনা মাত্রেরই কারণ আছে—ইহা আমরা পূর্ব্ব হইতে জানি বলিয়া যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহারি কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছি। পণ্ডিতেরা ইহাও পরীক্ষা করিতে ত্রুটি করেন নাই যে পৃথিবীর স্থান-বিশেষে সূর্য্যের দৈনিক উদয়াস্ত হয় কি না; কিন্তু দেশ কাল অসীম কি সসীম? আমি এক কি অনেক? ঘটনা-বিশেষের কোন কারণ আছে বা নাই? এ সকল বিষয় পরীক্ষা করা উন্মাদ ভিন্ন আর কাহারো কার্য্য হইতে পারে না। মূলতত্ত্ব-সকলকে আমরা বহির্ব্বস্তু হইতে প্রাপ্ত হই নাই, আপন কর্ত্তৃত্বে পরীক্ষা করিয়াও প্রাপ্ত হই নাই, তবে উহারদিগকে কোথা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি? মূল তত্ত্ব-সকল অবশ্যম্ভাবী, নির্ব্বিকল্প, সার্ব্বভৌমিক ও অনতিক্রমণীয়; সুতরাং অবশ্যম্ভাবী, নির্ব্বিকল্প, অনতিক্রমণীয়, সর্ব্বান্তর্যামী,

এক জন পুরুষ হইতেই উহা আমারদের আত্মাতে অবতীর্ণ হইতেছে। অনেক প্রত্যক্ষ-বিষয়ের মধ্য হইতে বুদ্ধি যখন এক একটি তত্ত্ব সংগ্রহ করে, তখন তাহাতে যেমন একই জীবাত্মার উপলব্ধি হয়; সেই রূপ প্রজ্ঞা যখন অনেক জীবাত্মার মধ্য হইতে এক এক মূল তত্ত্বের সন্ধান পায়, তখন তাহাতে একই পরমাত্মার পরিচয় পাওয়া হয়। পরমাত্মা সর্ব্বান্তর্যামী বলিয়াই মূল তত্ত্ব-সকল, সকলের আত্মাতেই সমান-ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। আমরা যে সকল জ্ঞান আপন বুদ্ধি-প্রভাবে উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহার মূল আমরা আপনারা, ইহাতে আর সংশয় হইতে পারে না; কিন্তু যাহা আমরা বুদ্ধি চালনা ব্যতিরেকেও সহজেই প্রাপ্ত হইয়াছি, এমন সকল সহজ জ্ঞানের কেবল তিনিই মাত্র আকর হইতে পারেন, যিনি আমারদের আত্মার আকর। যিনি আমাদের আত্মার আকর, যাঁহা হইতে আমরা আত্মা পাইয়াছি এবং যাঁহার বলে আমাদের আত্মা বিধৃত রহিয়াছে; তাঁহা হইতেই আমারদের সহজ জ্ঞান-সকল সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হইতেছে। আমি যেমন আপনার চেষ্টাতে পৃথিবীতে আসি নাই, "আমি আছি" এ জ্ঞানও সেই রূপ আমার আপন চেষ্টাতে উদ্ভূত হয় নাই—প্রত্যুত আমি যেখান হইতে আসিয়াছি, "আমি আছি" এ জ্ঞানও সেইখান হইতে আসিয়াছে এবং অদ্যাপি আসিতেছে। এই রূপ আর আর যত মূল জ্ঞান আছে, সকলই সেই একই আকর হইতে বিনির্গত হইতেছে। ইন্দ্রিয়-বোধ-সকলের সাক্ষাৎ আকর বহির্ব্বস্তু, বুদ্ধি-ক্রিয়া-সকলের সাক্ষাৎ আকর জীবাত্মা, প্রজ্ঞার মূল-তত্ত্ব-সকলের সাক্ষাৎ আকর পরমাত্মা।

বর্ত্তমান প্রস্তাব-সম্বন্ধে দর্শনকারদিগকে তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম, যাঁহারা বলেন যে জড় শক্তি হইতে মূল-তত্ত্ব সকল উদ্ভূত হইয়াছে, তাঁহারদিগকে শাক্ত উপাধি দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়, যাঁহারা বলেন যে বুদ্ধি হইতে মূল তত্ত্ব-সকল উদ্ভূত হইয়াছে—সুতরাং আমরা আপনারাই মূল তত্ত্ব-সকলের উদ্ভাবক—তাঁহারদিগকে বৌদ্ধ উপাধি দেওয়া যাইতে পারে। তৃতীয়, যাঁহারা বলেন, পরব্রহ্মই মূল তত্ত্ব-সকলের আকর—তাঁহাদের কথাই যথার্থ—তাঁহারদিগকে ব্রাহ্ম উপাধি দেওয়া গেল। শাক্তেরা জড় শক্তিকেই মূল সত্তা বিবেচনা করেন—ইঁহারদের মতে জড় শক্তি হইতেই আত্মা উদ্ভূত হইয়াছে, এবং তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে। বৌদ্ধেরা আপনাকেই মূল সত্য বিবেচনা করেন। ইঁহারা মনে করেন যে যদি আমি না থাকিতাম, তাহা হইলে আমার সম্বন্ধে জগৎও থাকিত না, ঈশ্বরও থাকিতেন না—আমি থাকাতেই আমার সম্বন্ধে ঈশ্বর থাকিতে পারিতেছেন ও জগৎ থাকিতে পারিতেছে। অতএব আমিই মূল সত্য, আর আর সত্য আমারই আনুসঙ্গিক। ইঁহারদের মতে বাহিরের জড় বস্তু সকল বিষয়ীরই আবির্ভাব, এবং ঈশ্বর বিষয়ী হইতেই উদ্ভাবিত। ইঁহারা সকল তত্ত্বেরই বাস্তবিকতা বিষয়ে সংশয় করেন; কারণ আমি লইয়াই যখন সকল সত্য, তখন আমার বাহিরে সত্য কি রূপে থাকিবে—ভ্রমবশতই আমরা বস্তু-সকলকে বাহিরে উপলব্ধি করি। এই রূপ বৌদ্ধেরা অবশেষে সংশয়বাদী হইয়া পরিণত হন। ব্রাহ্মেরা বলেন যে পরব্রহ্ম হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই স্থিতি করিতেছে এবং তাঁহা-

হই প্রসাদাৎ অনন্ত কাল উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। সকলই বাস্তবিক; সত্য স্বরূপ পরব্রহ্মের প্রসাদে সকলই সত্য, কিছুই স্বপ্নবৎ অর্থ-শূন্য নহে, সকলেরই গূঢ় অর্থ আছে; সকলই মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত রহিয়াছে; মূলে সকলই সত্য, পরিণামে সকলই মঙ্গল; পরব্রহ্ম সেতু-স্বরূপ হইয়া সমুদায় জগৎ ধারণ করিতেছেন। এই তিন প্রকার মতের মধ্যে শেষোক্ত মতই সত্য, তাহাতে আর সংশয় নাই। শাক্তেরা* এই রূপ সিদ্ধান্ত করেন যে ইন্দ্রিয়-বোধ হইতেই ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার উদ্রেক হয়। বৌদ্ধেরা† এই রূপ স্থির করেন যে আমারদের আত্ম-কর্তৃত্ব অবশ্য ইন্দ্রিয়-বোধ হইতে স্বতন্ত্র; কিন্তু আমরা যে হেতু বুদ্ধিরই স্রোত অনুসরণ করিয়া প্রজ্ঞাতে আরোহণ করি, এই হেতু বুদ্ধির দ্বৈধ-জনক তর্ক-বিতর্ক-ময় সিদ্ধান্তেরই উপর প্রজ্ঞার তত্ত্ব সকল নির্ভর করিতেছে। ব্রাহ্মেরা‡ এই রূপ নিশ্চয় করেন যে ইন্দ্রিয় বোধ হইতে বুদ্ধি উদ্ভূত হয় নাই, এবং বুদ্ধি হইতেও প্রজ্ঞা উদ্ভূত হয় নাই; কিন্তু উহারা তিনই আপন আপন উচ্চ নীচ পদবী অনুসারে সমবেত হইয়া কার্য্য করিতেছে। অস্ফুট মুকুলের পত্র-সকল যে রূপ সংহত-ভাবে অবস্থান করে, এবং প্রস্ফুটন-কালে উহারা যে রূপ পৃথক্ পৃথক্ রূপে পরিণত হয়; সেই রূপ অতীব শৈশব কালের অস্ফুট অবস্থায় ইন্দ্রিয়-বোধ, বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞা, তিনই সংহত ও সম্বৃত ভাবে অবস্থান করে, পরে বয়ো-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহারা পৃথক্ পৃথক্ হইয়া প্রকাশ পাইতে থাকে। মনুষ্যের শৈশব কালে ইন্দ্রিয়-বোধ-সকল যেমন প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, বুদ্ধিও তেমনি প্রজ্ঞাকে অবলম্বন করিয়া বিষয়-সকলকে আয়ত্ত করিবার জন্য চেষ্টা পাইতে থাকে। শৈশব কালে সকল ঘটনাই নূতন—সে সময়ে কি জানিব? জানিবার আছে কি? জানিয়া ফল কি? এবম্বিধ বিলাপ-ধ্বনির এক মুহূর্ত্তও অবকাশ থাকে না। নূতন ভাষা শিক্ষা করিতে গেলে ব্যাকরণ আবশ্যক, অভিধান আবশ্যক, গ্রন্থ পাঠ আবশ্যক, আর আর কত না আবশ্যক; কিন্তু এক জন অনভিজ্ঞ শিশু কেমন অবলীলা-ক্রমে একটা ভাষাকে আয়ত্ত করিয়া ফেলে—উহাকে চেষ্টা করিয়া কেহই শিক্ষা দান করে না, উহার আপন সহজ চেষ্টাই সর্ব্বস্ব। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে কুকুরাদি জন্তু-বিশেষ যেমন ইন্দ্রিয়-বোধের উত্তেজনা বশতঃ মনুষ্যের কথানুসারে কার্য্য করে, শিশুর ভাষা শিক্ষাও সেই প্রণালীতেই সম্পন্ন হয়; কিন্তু কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই প্রকাশ পাইবে যে পূর্ব্বোক্তের সহিত শেষোক্তের কেবল মাত্রার প্রভেদ নহে, উহারদের মধ্যে স্বরূপতই প্রভেদ। একটা কুকুর প্রভুর মুখ হইতে একটি বিশেষ শব্দ শুনিবা মাত্র অমনি একটি বিশেষ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবে; কিন্তু সহস্র কথা কর্ণ গোচর করিয়াও একটি ব্যাকরণ-ঘটিত নিয়মকে কোন কালে আয়ত্ত করিতে পারিবে না। পূর্ব্বোক্ত রূপ বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়-বোধের অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করা অন্ধ অভ্যাসেরই গুণে হইয়া থাকে; কিন্তু বিশেষ বিশেষ শব্দ শ্রবণ হইতে ব্যাকরণ-ঘটিত সাধারণ নিয়মে পদ নিক্ষেপ করা সবিশেষ বুদ্ধি চালনা ব্যতিরেকে কোন রূপেই সম্ভব সাধ্য নহে। একটা কুকুর শ্রুত শব্দ অনুসারে কার্য্য করে মাত্র; কিন্তু

* Locke, objective.

† Kant, subjective.

‡ Coussin, from subjective to objective from Psychology to Ontology.

এক জন শিশু, কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া প্রভৃতি ব্যাকরণের নিয়মানুসারে শব্দের অর্থ সংগ্রহ করিয়া লয়। এ দুই ক্রিয়া যে এক নহে, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। একটি শিশু কেমন আগ্রহের সহিত নূতন নূতন বস্তুর প্রতি মনঃ সমর্পণ করে, এবং কেমন অক্লেশে পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা-সকলের সহিত উপস্থিত ঘটনা-সকলের যোগ সাধন করিয়া জ্ঞান-রাজ্যকে ক্রমশই বিস্তার করিতে থাকে। পরিবার পাঠশালা—মাতা-পিতা যেখানকার শিক্ষক ও ভ্রাতা ভগিনী যেখানকার বয়স্য দল—এই আদিম পাঠশালার শিক্ষা-প্রণালীর প্রতি মনোযোগ করিয়া দেখিলে কোন্ সচেতন ব্যক্তি এ রূপ কথা মুখে আনিতে পারে যে শিশুদিগের অস্ফুট হৃদয়ে মনুষ্যত্বের অধিষ্ঠান নাই! পরিবার পাঠশালার স্নেহময় ক্রোড় হইতে সামাজিক পাঠশালায় প্রবেশ কালে বালকেরা সহজ অবস্থা হইতে কঠোরতায় পদ নিক্ষেপ করে; এক জন বালক পরিবার-পাঠশালায় কোন শৃঙ্খলা ব্যতিরেকেও যে ব্যাকরণ দুই বৎসরে আয়ত্ত করিয়াছে, সামাজিক পাঠশালায় তাহাই আবার শৃঙ্খলা-অনুসারে শিক্ষা করিতে গিয়া চারি বৎসরেও পারিয়া উঠে না। মনুষ্য-শিশুর মনে বাহির হইতে যেমন ইন্দ্রিয়-বোধ কার্য্য করিতে থাকে, অন্তর হইতেও সেই রূপ বুদ্ধির প্রভাব স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে এবং তাহার আরো অভ্যন্তর হইতে প্রজ্ঞার প্রসাদ ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ অবতীর্ণ হইতে থাকে। প্রজ্ঞা ব্যতীত মনুষ্যোচিত উন্নতিশীল বুদ্ধি-ক্রিয়া কি রূপে চলিবে? বুদ্ধি কর্ত্তৃক জ্ঞান উপার্জ্জনের অন্ত নাই—মনুষ্যের মন ক্রমিকই ভাবিতেছে, ক্রমিকই বুদ্ধি প্রয়োগ করিতেছে, ক্রমিকই জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেছে, উহা এক দণ্ডও নিশ্চিন্ত নাই। উহা যখন জ্ঞান-পথের এক বার পথিক হইয়াছে, তখন উহা চিরকালই তাহাই থাকিবে; কিন্তু উহার গম্য নিকেতন কোথায়? জ্ঞানের মূল উৎস কোথায়? জ্ঞান পথিকের অবলম্বন-যষ্টি কোথায়? প্রজ্ঞাই জ্ঞানের গম্য স্থান, প্রজ্ঞাই জ্ঞানের মূল উৎস, প্রজ্ঞাই জ্ঞানের অবলম্বন-যষ্টি—প্রজ্ঞা ব্যতীত উন্নতিশীল বুদ্ধি-ক্রিয়া এক পদও চলিতে পারে না। অসীম-উন্নতি-স্পৃহা ব্যতিরেকে মনুষ্য-শিশু কি জন্য নব নব সামগ্রী শিক্ষা করিতে যত্ন পাইবে? একটা পশুকে বেত্রাঘাত পূর্ব্বক শিক্ষা দিতে হয়; কিন্তু মনুষ্য-শিশু যেমন আগ্রহের সহিত স্তন্য পান করে, তেমনি আগ্রহের সহিত জ্ঞান শিক্ষা করে। অসীম ভাব, জ্ঞান-স্পৃহা, আত্মার স্থায়িত্ব, এই সকল ভাব শিশুর মনে অব্যক্ত-ভাবে অবস্থান করে বলিয়া উহা পশু হইতে সমধিক অসহায় হইলেও উহাকে তদপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। মনুষ্য-শিশুর মনে ইন্দ্রিয়-বোধও যে সময় কার্য্য করে, বুদ্ধিও সেই সময় কার্য্য করে, প্রজ্ঞাও সেই সময়ে কার্য্য করে; কিন্তু উহারা অস্ফুট ভাবেই কার্য্য করে। এই জন্য এ সময়ে উহারদিগকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে ধরিতে পারা যায় না; পরন্তু এ সময়েও যে উহারা তিনই একত্রে স্ফূর্ত্তি পায়, এ বিষয়ে কিছু মাত্র সংশয় নাই।

স্মৃতি শাস্ত্র।

ভারত বর্ষের প্রসিদ্ধ জাতি-ভেদ-প্রণালী মনু-সংহিতা প্রণয়ন কালে বিশিষ্ট-রূপে প্রচলিত ছিল, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু মনু-সংহিতাতে সেই জাতি-ভেদের যে অদ্ভুত কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার বিষয় এক বার আলোচনা করা আবশ্যক।

মনু-সংহিতাতে আছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও চরণ হইতে* উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই মনু-সংহিতাতেই সৃষ্টি প্রকরণের যে প্রণালী উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, জাতি-ভেদের এই আশ্চর্য্য কারণটি যেন বল পূর্ব্বক নিবেশিত করা হইয়াছে। সৃষ্টি-প্রকরণ এই রূপ ভাবে আছে যে, "ব্রহ্মা আপনার শরীরকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধ ভাগ দ্বারা পুরুষ ও অর্দ্ধ ভাগ দ্বারা নারী হইলেন; সেই পুরুষ সেই নারীতে বিরাট্ পুরুষকে উৎপন্ন করিলেন। সেই বিরাট্ পুরুষ স্বয়ং তপস্যা করিয়া এই সকলের স্রষ্টা মনুকে সৃষ্টি করিলেন। মনু প্রজা সৃষ্টির অভিলাষে অতিদুষ্কর তপস্যা করিয়া প্রথমে মরীচিপ্রভৃতি দশ জন মহর্ষি প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিলেন। এই সকল প্রজাপতি আর সাত জন মনু, দেব, দেবলোক, অন্যান্য মহর্ষি, যক্ষ রক্ষ, বিদ্যুৎ বজ্র, কিন্নর বানর ও কৃমি কীট প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম সমুদায় সৃষ্টি করিলেন†।" এই রূপে যখন ব্রহ্মা হইতে বিরাট্, বিরাট্ হইতে মনু, মনু হইতে দশ প্রজাপতি ও দশ প্রজাপতি হইতে আর আর সৃষ্টির কথা ক্রমান্বয়ে উল্লিখিত হইয়াছে; তখন ইহার মধ্যে ব্রহ্মার চারি অঙ্গ হইতে চারি জাতির উৎপত্তির কথা কোন রূপেই স্থান পাইতে পারে না।

ব্রহ্মা কি রূপে উৎপন্ন হইলেন, মনু-সংহিতা অনুসারে তাহার আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রথমে সমুদায় জগৎ অন্ধকারময় ছিল, তৎপরে ভগবান্ স্বয়ম্ভু প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি স্বীয় শরীর হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টির অভিলাষে প্রথমে জল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বীজ নিক্ষিপ্ত করিলেন। সেই বীজ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন অণ্ড রূপ ধারণ করিল; তন্মধ্যে সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি সেই অণ্ডে সম্বৎসর বাস করিয়া স্বয়ংই আপনার ধ্যান-প্রভাবে তাহাকে দুই-ভাগে বিভক্ত করিলেন এবং সেই খণ্ড-দ্বয় দ্বারা স্বর্গ ও ভূমণ্ডল, মধ্যে আকাশ, অষ্ট দিক্ ও সমুদ্র সকল নির্ম্মাণ করিলেন*। ইহার মধ্যেও ব্রাহ্মণাদি বর্ণ উৎপত্তির অবকাশ হইতে পারে না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রহ্মা আপনার মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগকে কোন্ সময়ে উৎপন্ন করিয়াছিলেন? পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা আপনার শরীরকে দুই-ভাগ করিয়া অর্দ্ধ ভাগে স্ত্রী ও অর্দ্ধ ভাগে পুরুষ হইয়াছিলেন, এবং সেই স্ত্রী ও পুরুষ হইতে বিরাট্ পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। তিনি মনুকে সৃষ্টি করিলেন, মনু মরীচি প্রভৃতি দশ জন প্রজাপতিকে ও সেই দশ জন প্রজাপতি অন্যান্য মনু, দেবতা, মহর্ষি ও যক্ষ, রক্ষ, প্রভৃতিকে সৃষ্টি করিলেন। অতএব ব্রহ্মা স্ত্রী ও পুরুষ-রূপ পরিগ্রহ করিবার পূর্ব্বে অথবা পরে আপনার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হইতে কি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ উৎপন্ন করিয়াছিলেন? মনুসংহিতার যে স্থলে উল্লিখিত আছে যে—

দ্বিধা কৃত্বাত্মনোদেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবং।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥
১।৩২

* লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥
১।৩১

লোকসকলের বৃদ্ধির নিমিত্ত ব্রহ্মা মুখ, বাহু, উরু ও চরণ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রকে নির্ম্মাণ করিলেন।

† ১ অধ্যায়। সৃষ্টি প্রকরণ।

* ১ অধ্যায়। সৃষ্টি প্রকরণ।

তাহারই অব্যবহিত পূর্ব্বে লিখিত হই-য়াছে যে—

লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥
১। ৩১

যদি এই ক্রম ধরিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে বিরাট্ প্রভৃতির পূর্ব্বজাত বলিয়া স্থির করা হয়, তাহা হইলে বিরাট্ পুরুষ হইতে ক্রমে ক্রমে সমুদায় জীব জন্তুর সৃষ্টি ও ব্রহ্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আবার কতকগুলির সৃষ্টি, এই রূপ দুই প্রকার সৃষ্টি হইয়া উঠে। যদি স্ত্রীপুরুষ-রূপধারী ব্রহ্মা হইতে বিরাট্ প্রভৃতি সৃষ্টি পরম্পরার মধ্যে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের উৎপত্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ঐ চারি বর্ণকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মার অঙ্গ সমুৎপিত বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না। অতএব মনুসংহিতাতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ভেদের যে কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে, মনুসংহিতার অনুগত হইয়া তাহা কোন রূপেই সংলগ্ন করা যায় না। মনুসংহিতার বর্ণ-ভেদসূচক ঐ বচনটিকে, মনুসংহিতার নয়, বলাও যায় না; কেন না মনুসংহিতার প্রায় যাবতীয় ব্যবস্থাই বর্ণ-ভেদ-ঘটিত, সুতরাং তৎসমুদায় ঐ বচনের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অনেকে অনুমান করেন, মনুসংহিতা প্রণয়নের বহু কাল পূর্ব্ব হইতে বর্ণ ভেদ প্রণালী প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, মনুসংহিতা প্রণেতা তাহার মূল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া কুসংস্কারবশত অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বক এই রূপ অদ্ভুত কারণের কল্পনা করিয়াছেন।

মনুষ্য শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুশীলন করিলে এই প্রতীতি হয় যে, যাবতীয় মনুষ্যই মনুর সন্তান *। ইহা হইতে এই প্রতিপন্ন হয় যে, সকল মনুষ্যই প্রথমে একবর্ণ ছিল। ইতিহাস দ্বারা ইহা এক প্রকার সপ্রমাণ হইয়াছে যে, হিন্দুজাতি ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী নহেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে ভারত বর্ষে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা প্রথমে যখন এদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তখন এক বর্ণই ছিলেন, তাহা অসম্ভাবিত বোধ হয় না। তৎপরে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের বংশ যেমন বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হইল, সেই সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতারও সঞ্চার হইতে লাগিল, সমাজমধ্যে নানাবিধ কার্য্যের প্রয়োজন হইল; পশুপালন, কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প-কর্ম্ম সকল প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা অনুসারে তাঁহাদের মধ্যে যিনি যে কর্ম্মের উপযুক্ত হইলেন, এবং যাঁহার পক্ষে যে কর্ম্ম করা আবশ্যক হইয়া উঠিল, তিনি সেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। যিনি যে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত থাকেন, তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি, অনবরত দৃষ্টান্তে ও সংস্রবে সেই ব্যবসায়ের প্রতিই অনুরক্ত হইয়া থাকে। এই কারণে প্রায় অনেকেই স্বাধীনতা সত্ত্বেও পৈতৃক ব্যবসায়েই ব্যাপৃত হইয়া পড়েন। হিন্দু-সমাজে এই রূপ করিয়াই যে এক একটি কর্ম্ম এক এক জাতির জাতীয় ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। কালক্রমে সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়া উঠিল। তৎপরে শাস্ত্রকারেরা আরও বিশেষ করিয়া চিরকালের নিমিত্ত তাহাদিগকে সেই রূপ বিভাগ করিয়া রাখিলেন, এবং রাজারা স্বীয় স্বীয় অমাত্য শাস্ত্রকারদিগের মন্ত্রণায় দণ্ড সহকারে সেই রূপ বর্ণ বিভাগ সকল রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই রূপে ভারতবর্ষের বর্ণভেদ-প্রণালী বদ্ধমূল হইয়া গেল। জাতি-ভেদ-প্রণালীর যে মূল কারণ প্রদর্শিত হইল, তাহা আমা-

* মনুস্ শব্দ হইতে মনুষ্য শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে।

দের কপোল কল্পিত নহে; মনুসংহিতাতে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট না থাকুক অন্যান্য শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে।

ন বিশেষোস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্ব-সৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতং ॥
মহাভারত মোক্ষধর্ম্মঃ।

বর্ণ সকলের প্রভেদ নাই; সকলেই ব্রাহ্মণ; প্রথমে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া কর্ম্ম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ হইয়াছে।

কাম-ভোগ-প্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মারক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥
মহাভারত মোক্ষধর্ম্মঃ।

বিষয়ভোগে আসক্ত, উগ্র ও কোপনস্বভাব, সাহস প্রিয়, স্বধর্ম্মচ্যুত রজোগুণ-বিশিষ্ট দ্বিজগণ ক্ষত্রিয় হইলেন।

গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতা কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাবৈশ্যতাং গতাঃ ॥
মহাভারত মোক্ষধর্ম্মঃ।

যে সকল দ্বিজ রজোগুণ ও তমোগুণে মিশ্রিত, পশুপালন ও কৃষি যাঁহাদের উপজীবিকা, যাঁহারা স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না, তাঁহারা বৈশ্য হইলেন।

হিংসানৃতক্রিয়ালুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ॥
মহাভারত মোক্ষধর্ম্মঃ।

যে সকল দ্বিজ হিংসা ও মিথ্যা কর্ম্মে লুব্ধ, যাঁহারা জীবিকার নিমিত্ত সকল কর্ম্মই করেন, যাঁহারা তমোগুণ বিশিষ্ট ও শৌচাচার ভ্রষ্ট, তাঁহারা শূদ্র হইলেন।

মহাভারতের এই সকল প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যে একমাত্র ব্রাহ্মণ বর্ণ স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে জাতিভেদের যে প্রণালী দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে পূর্ব্বে এ প্রকার ছিল না। এক্ষণে ব্রাহ্মণ-পুত্র, কুলোচিত কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান না করিলেও ব্রাহ্মণই থাকেন এবং অন্যান্য জাতি উৎকৃষ্ট কর্ম্ম করিলেও কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। পূর্ব্বে একপ নিয়ম ছিলনা। মনুসংহিতাতে জাতিভেদের প্রকৃত কারণ প্রদর্শিত হয় নাই বটে, কিন্তু মনুসংহিতা প্রণয়ন কালে হিন্দুসমাজে যে সকল আচার ব্যবহার প্রচলিত ছিল, তাহাতে তাহার নিদর্শন অবশ্যই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে,

শূদ্রোব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈবচ ॥

শূদ্র ব্রাহ্মণ হন ও ব্রাহ্মণ শূদ্র হন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পুত্রদিগকেও এই প্রকার জানিবে।

এই বিষয়টি মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে বিস্তৃত রূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

এভিস্তু কর্ম্মভির্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা।
শূদ্রোব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ ॥
এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোপ্যাগমসম্পন্নোদ্বিজোভবতি সংস্কৃতঃ ॥
ব্রাহ্মণোবাপাসদ্বৃত্তঃ সর্ব্বসঙ্করভোজনঃ।
ব্রাহ্মণ্যং সমনুৎসৃজ্য শূদ্রোভবতি তাদৃশঃ ॥
কর্ম্মভিঃ শুচিভির্দেবি শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
শূদ্রোপি দ্বিজবৎ সেব্যইতি ব্রহ্মানুশাসনং ॥
স্বভাবং কর্ম্ম চ শুভং যত্র শূদ্রেপি তিষ্ঠতি।
বিশিষ্টঃ স দ্বিজাতের্ব্বৈ বিজ্ঞেয়ইতি মে মতিঃ ॥
ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং নচ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণং ॥
সর্ব্বোয়ং ব্রাহ্মণোলোকে বৃত্তেন চ বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোপি ব্রাহ্মণত্বং নিয়চ্ছতি ॥
ব্রহ্মস্বভাবঃ কল্যাণি সমঃ সর্ব্বত্র মে মতিঃ।
নির্গুণং নির্ম্মলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি স দ্বিজঃ ॥
এতত্তে গুহ্যমাখ্যাতং যথা শূদ্রোভবেদ্দ্বিজঃ।
ব্রাহ্মণো বা চ্যুতোধর্ম্মাৎ যথা শূদ্রত্বমাপ্নুতে ॥

হে দেবি! শূদ্র এই সকল শুভ কর্ম্ম ও সদাচার দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে এবং বৈশ্যও ক্ষত্রিয় হইতে পারে। হে দেবি! হীন জাতিতে ও হীন বংশে সমুৎপন্ন শূদ্রও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া এই সকল

কর্ম্ম কল দ্বারা সংস্কার সম্পন্ন দ্বিজ হইয়া থাকেন। আর ব্রাহ্মণও সেই রূপ দুশ্চরিত্র ও সঙ্করভোজী হইলে ব্রাহ্মণত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া শূদ্র হয়। হে দেবি! শুদ্ধাত্মা জিতেন্দ্রিয় শূদ্রও শুদ্ধাচার নিবন্ধন ব্রাহ্মণের ন্যায় সেবনীয় হন, ব্রহ্মার এই প্রকার অনুশাসন। যে শূদ্রের স্বভাব ও কর্ম্ম পবিত্র হয়, সেই শূদ্রও দ্বিজাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, আমার এই মত। জন্ম, সংস্কার, শাস্ত্র ও বংশ দ্বিজত্ব লাভের কারণ নহে; এক মাত্র চরিত্রই তাহার কারণ। পৃথিবীতে সকলেই চরিত্র দ্বারা ব্রাহ্মণ হইতে পারে; সুতরাং শূদ্রও সাধুশীল হইলে ব্রাহ্মণ হয়। হে কল্যাণি! আমার মত এই যে, ব্রহ্মের স্বভাব সর্ব্বত্রই সমান; অতএব নির্গুণ নির্ম্মল ব্রহ্ম যাহাতে অবস্থান করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। শূদ্র যে প্রকারে ব্রাহ্মণ হইতে পারে ও ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম-চ্যুত হইয়া যাহাতে শূদ্র হয়, তাহার গূঢ় বৃত্তান্ত তোমাকে বলিলাম।

অন্য অন্য জাতির ব্রাহ্মণত্ব লাভ বিষয়ে মনুসংহিতা ও মহাভারতের যে সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইল, তাহার ভূরি ভূরি উদাহরণও সংগৃহীত হইতে পারে।

ততো ব্রাহ্মণতাং যাতো বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
ক্ষত্রিয়ঃ সোঽপ্যথ তথা ব্রহ্মবংশস্য কারকঃ॥

মহাভারতীয় অনুশাসন পর্ব্ব।

সেই মহাতপা বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও তৎপরে ব্রাহ্মণ হইলেন এবং তাঁহা হইতে ব্রাহ্মণ বংশের উৎপত্তি হইল।

প্রতিরথাৎ কণ্বস্তস্যাপি মেধাতিথির্যতঃ কণ্বায়নাদ্বিজাঃ বভূবুঃ।

বিষ্ণু পুরাণ। ৪ অংশ। ১৯ অধ্যায়ঃ।

ক্ষত্রিয় প্রতিরথের পুত্র কণ্ব; কণ্বের পুত্র মেধাতিথি; মেধাতিথি হইতে কণ্বায়ন ব্রাহ্মণ সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

হরিবংশের দ্বাত্রিংশ অধ্যায়েও এই কথা উল্লিখিত আছে।

পুত্রঃ প্রতিরথস্যাসীৎ কণ্বঃ সমভবন্নৃপঃ।
মেধাতিথিঃ সুতস্তস্য যস্মাৎ কণ্বোত্তবেদ্দ্বিজঃ॥
মহাবীর্য্যাদুরুক্ষয়ো নাম পুত্রোঽভূৎ। তস্য ত্রয্যারুণপুষ্করিণৌ কপিশ্চ পুত্রত্রয়মভূৎ। তচ্চ ত্রিতয়মপি পশ্চাৎ বিপ্রতামুপজগাম।

বিষ্ণু। ৪ অং। ১৯। অ

ক্ষত্রিয় মহাবীর্য্যের পুত্র উরুক্ষয়। উরুক্ষয়ের তিন পুত্র; ত্রয্যারুণ, পুষ্করী, ও কপি। এই তিন জনই পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

দিবোদাসস্য দায়াদো ব্রহ্মর্ষি র্মিত্রয়ুর্নৃপঃ
মৈত্রায়ণস্ততঃ সোমো মৈত্রেয়াস্তু ততঃ স্মৃতাঃ।

হরিবংশ। ৩২। অ

দিবোদাসের পুত্র রাজা মিত্রয়ু ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মৈত্রায়ণ। তাঁহার পুত্র সোম। সোম হইতে মৈত্রেয় ব্রাহ্মণ সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

কেবল যে ক্ষত্রিয়েরাই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিল এমন নহে; স্কন্দ পুরাণীয় সহ্যাদ্রি খণ্ডের উত্তর কাণ্ডে কৈবর্ত্তদিগেরও ব্রাহ্মণত্ব লাভের কথা উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়।

অব্রাহ্মণে তদা দেশে কৈবর্ত্তান্ প্রেক্ষ্য ভার্গবঃ।
——————যজ্ঞসূত্রমকল্পয়ৎ॥
স্থাপয়িত্বা স্বকীয়ে স ক্ষেত্রে বিপ্রান্ প্রকল্পিতান্।
যামদগ্ন্যস্তদোবাচ সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা॥

তখন সেই ব্রাহ্মণ-হীন দেশে কৈবর্ত্তদিগকে দেখিয়া পরশুরাম তাহাদিগকে যজ্ঞসূত্র প্রদান করিলেন। এবং স্বকৃত ব্রাহ্মণদিগকে স্বকীয় ক্ষেত্রে সংস্থাপিত করিয়া প্রীতি চিত্তে কহিলেন।

কেবল যে এক জাতি অন্য জাতি হইয়াছে তাহা নহে, এক বংশ হইতে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, ইহারও ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

করূষাৎ কারূষা মহাবলা ক্ষত্রিয়া বভূবুঃ।
নাভাগোনেদিষ্টপুত্রস্তু বৈশ্যতামগমৎ।
পৃষধ্রস্তু গুরুগোবধাৎ শূদ্রত্বমগমৎ।

বিষ্ণু। ৪ অং। ১ অ

বৈবস্বত মনুর পুত্রগণের মধ্যে করূষ হইতে মহাবল ক্ষত্রিয় কারূষগণ উৎপন্ন হইয়াছে, নেদিষ্টের পুত্র নাভাগ বৈশ্য হইয়াছিলেন, এবং পৃষধ্র গুরুর গোবধ নিবন্ধন শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এই নাভাগ হরিবংশে নাভাগারিষ্ট শব্দে উক্ত হইয়াছে।

নাভাগারিষ্ট পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।
করূষস্যতু কারুষাঃ ক্ষত্রিয়া যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ॥
পৃষধ্রো হিংসয়িত্বা তু গুরোর্গাং জনমেজয়।
শাপাচ্ছূদ্রত্বমাপন্নো।——————

হরিবংশং। ১১ অ

নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র বৈশ্য ছিলেন, ব্রাহ্মণ হইলেন। করূষের পুত্র কারুষগণ মহাযোদ্ধা ক্ষত্রিয় হইলেন। পৃষধ্র গুরুর গবী বধ করিয়া শাপে শূদ্র হইলেন।

বিষ্ণু পুরাণে উক্ত হইয়াছে নাভাগ বৈশ্য হইয়াছিলেন, হরিবংশে কথিত হইতেছে যে, নাভাগের পুত্রদ্বয় বৈশ্যত্ব হইতে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন

কাশলেশগৃৎসমদাস্ত্রয়োস্যাভবন্। গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্বর্ণ্যপ্রবর্ত্তয়িতা।

বিষ্ণু। ৪ অং। ৮ অ

সুনহোত্রের তিন পুত্র—কাশ, লেশ ও গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র শৌনক হইতে চারি বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছিল।

হরিবংশে এই লেশ শল নামে ও শৌনক শুনক নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

সুনহোত্রস্য দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ।
কাশ শলশ্চ দ্বাবেতৌ তথা গৃৎসমদঃ প্রভুঃ।
পুত্রোগৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈবচ।

২৯ অ

সুনহোত্রের পরম ধার্ম্মিক তিন পুত্র—কাশ, শল ও গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র শুনক; শুনকের পুত্র শৌনকগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইয়াছিল।

ভার্গস্য ভার্গভূমিরতশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যপ্রবৃত্তিঃ।

বিষ্ণু। ২৯ অ।

ভার্গের পুত্র ভার্গভূমি; ভার্গভূমি হইতে চারি বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে।

এতে হ্যঙ্গিরসঃ পুত্রা জাতাবংশেথ ভার্গবে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ ভরতর্ষভ।

হরিবংশ। ৩২ অ।

ভৃগুবংশীয় অঙ্গিরার পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইয়াছিলেন।

তথা গৃৎসমতেঃ পুত্রাঃ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বিশঃ।

হরিবংশ। ৩২ অ।

গৃৎসমতির পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইয়াছিল।

অতএব যখন মনুসংহিতাতে এক জাতির অন্য জাতি হইবার ব্যবস্থা আছে এবং হরিবংশাদিতে যখন তাহার ভূরি ভূরি উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইয়াছে, ও এক বংশ হইতে চারি জাতি উৎপন্ন হইবার কথা স্পষ্ট উল্লিখিত আছে, তখন ইহাই বোধ হয় যে, হিন্দুসমাজ প্রথমে কর্ম্মানুসারেই জাতি প্রাপ্ত হইত। মনু সংহিতাতে ব্রহ্মার অঙ্গ বিশেষ হইতে জাতি বিশেষের উৎপত্তির যে উল্লেখ আছে, তাহা কল্পনা মাত্র সন্দেহ নাই।

বহুবিবাহ।

ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে আমাদের বহু কালের আকাঙ্ক্ষিত একটী মনোরথ সফল হইবার উপক্রম হইয়াছে। যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকাতে ভারতবর্ষের বহু-বিষয়ে বহুবিধ অনিষ্ট ঘটিতেছে, দেশহিতৈষী মহাত্মাদিগের উদ্যোগে ও প্রযত্নে রাজপুরুষগণ তাহার নিষেধ বিষয়ক নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত সচেষ্টিত হইয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে একবার এই বিষয়ের উদ্যোগ হইয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে তৎকালে ইহা সুসিদ্ধ হইয়া উঠে নাই। বোধ হয় এবারে অবশ্যই কৃতার্থতা লাভ হইবে।

যদিও আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহারের মধ্যে রাজপুরুষগণকে প্রবিষ্ট হইতে দিলে ভবিষ্যতে হিন্দুসমাজের অনিষ্ট হইতে পারে, তথাপি বহুবিবাহ দ্বারা

এরূপ অনিষ্ট হইতেছে যে, আমরা বর্ত্তমান উদ্যোগের অনুমোদন না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। জ্ঞান-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথাটি দিন দিন সংকুচিত হইয়া আসিতেছে যথার্থ বটে কিন্তু যত দিন বর্ত্তমান কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত থাকিবে ও সেই কৌলীন্য প্রথার অন্তর্গত মেল বন্ধনের উপর কুলীন পুত্রদিগের মান সম্ভ্রম নির্ভর করিবে, তত দিন অন্তত কোন কোন সম্প্রদায়কে বাধ্য হইয়া বহুবিবাহ প্রথার অনুসরণ করিতে হইবে। এ অবস্থায় রাজপুরুষগণের সাহায্য ব্যতীত এই কুপ্রথা আশু নিবারণের উপায়ান্তর নাই। বহুবিবাহের ন্যায় স্ত্রীলোকের অনুমরণও হিন্দু জাতির ধর্ম্ম-ঘটিত প্রথা। কিন্তু যদি তাহা নিবারণের নিমিত্ত রাজপুরুষগণের সাহায্য না লইয়া শিক্ষা-প্রচারের মুখ চাহিয়া থাকা হইত, তাহা হইলে অদ্যাপি সেই স্ত্রীহত্যা কি নিবারণ করা যাইত? সহমরণ প্রথা নিষিদ্ধ হওয়াতে স্ত্রীলোকদিগকে অপমৃত্যু হইতে রক্ষা করা হইয়াছে, বহুবিবাহ রহিত হইলে কতকগুলিকে জীবন্মৃত্যু হইতে রক্ষা করা হইবে। তদ্ভিন্ন এই অধিবেদন দ্বারা যে সকল অত্যাচার ঘটিয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইহা একান্ত ইচ্ছা বটে যে, হিন্দুসমাজ এ সকল বিষয়ে রাজপুরুষগণকে আহ্বান না করেন, কিন্তু আমাদের নির্জ্জীব হিন্দুসমাজ যে কত দিনে মানুষ হইয়া আপনাদের কাজ আপনারা করিবেন, তাহা ভাবিতে গেলে শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়।

নূতন পুস্তক।

১ নানকের জীবন চরিত। কষ্ট সাহেবের সংগৃহীত ইংরাজী পুস্তক হইতে বর্ণাকুলর লিটরেচর কমিটীর আদেশানুসারে শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত। যাঁহারা সংক্ষেপে নানকের জীবন চরিত জানিতে চান, এই পুস্তক খানি তাঁহাদের পক্ষে উপকারী হইবে।

২ চিকিৎসক। চিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধি-বিষয় পূর্ণ সাময়িক পত্র। হিন্দু যন্ত্রে ভক্তেশ্বর নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত, চিকিৎসক সভা হইতে প্রকাশিত। বাঙ্গলা বৈদ্যজিক পত্রের অভাব বিমোচন ও নানাবিধ উপায়ে এতদ্দেশীয় ইংরাজি ভাষানভিজ্ঞ চিকিৎসা-বিদ্যার্থী, বিশেষতঃ কলিকাতা মেডিকেল কালেজের বাঙ্গলা বিভাগের ছাত্রদিগের উপকার সাধন করা এই চিকিৎসক পত্রের উদ্দেশ্য। এই পত্র খানি দ্বারা বাঙ্গলা দেশের যে মহোপকার সাধিত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

৩ প্রসূতি বিয়োগে তস্যাঃ সুত কাব্য। হিন্দু যন্ত্রে শ্রীভক্তেশ্বর নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত। গ্রন্থকারের নাম নাই।

৪ টমস পেন, বিশপ ওআটসনের পুস্তক উপলক্ষ্য করিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মের যে অসারতা প্রতিপাদন করিয়াছিল, তাহাই অবিকল ইংরাজিতে স্কুলবুক যন্ত্রে পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়াছে। প্রকাশকের নাম নাই।

৫ দায়ভাগার্থ দীপিকা। প্রতি পৃষ্ঠার ঊর্দ্ধভাগে শ্রীযুক্ত রঘুরাম শিরোমণি ভট্টাচার্য্য কৃত মূল ও নিম্নে তাহার বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ। শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক কলিকাতা নিউ বেঙ্গল প্রিন্টিং যন্ত্রে মুদ্রিত। দায় ঘটিত বিবাদের মীমাংসা বিষয়ে এই পুস্তক খানির যথেষ্ট আনুকূল্য পাওয়া যাইবে।

৬ নারীচরিত। কলিকাতা ফিমেল নর্ম্যাল ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভূত-পূর্ব্ব ছাত্রী ও কোন্নগর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী শ্রীসৌদামিনী সিংহ কর্ত্তৃক ইংরাজি ভাষা হইতে বাঙ্গলা ভাষায় সংগৃহীত। কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। এই পুস্তক খানির বিষয় ও রচনা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

THE MORAL PERFECTION OF JESUS.

The argument of Jesus concerning the tribute to Cæsar is so dramatic, as to strike the imagination and rest on the memory; and I know no reason for doubting that it has been correctly reported. The book of Deuteronomy (xvii. 15) distinctly forbids Israel to set over himself as king any who is not a native Israelite; which appeared to be a religious condemnation of submission to Cæsar. Accordingly, since Jesus assumed the tone of unlimited wisdom, some of Herods's party asked him, whether it was lawful to pay tribute to Cæsar, Jesus replied: "Why tempt ye me, hypocrites? Show me the tribute money." When one of the coins was handed to him, he asked: "Whose image and superscription is this?" When they replied: "Cæsar's," he gave his authoritative decision: "Render *therefore to Cæsar the things that are Cæsar's*."

In this reply not only the poor and uneducated, but many likewise of the rich and educated, recognize "majesty and sanctity:" yet I find it hard to think that my strong-minded friend will defend the justness, wisdom and honesty of it. To imagine that because a coin bears Cæsar's head, *therefore* it is Cæsar's property, and that he may demand to have as many of such coins as he chooses paid over to him, is puerile, and notoriously false. The circulation of foreign coin of every kind was as common in the Mediterranean then as now; and everybody knew that the coin was the property of the *holder*, not of him whose head it bore. Thus the reply of Jesus, which pretended to be a moral decision, was unsound and absurd: yet it is uttered in a tone of dictatorial wisdom, and ushered in by a grave rebuke, "Why tempt ye me, hypocrites?" He is generally understood to mean, "Why do you try to implicate me in a political charge?" and it is supposed that he prudently *evaded* the question. I have indeed heard this interpretation from high Trinitarians; which indicates to me how dead is their moral sense in everything which concerns the conduct of Jesus. No reason appears why he should not have replied, that Moses forbade Israel *voluntarily* to place himself under a foreign king, but did not inculcate fanatical and useless rebellion against overwhelming power. But such a reply, which would have satisfied a more commonplace mind, has in it nothing brilliant and striking. I cannot but think that Jesus shows a vain conceit in the cleverness of his answer: I do not think it so likely to have been a conscious evasion. But neither does his rebuke of the questioners at all commend itself to me. How can any man assume to be an authoritative teacher, and then claim that men shall not put his wisdom to the proof? Was it not their *duty* to do so? And when, in result, the trial has proved the defect of his wisdom, did they not perform a useful public service? In truth, I cannot see the Model Man in his rebuke.—Let not my friend say that the error was merely intellectual: blundering self-sufficiency is a moral weakness.

I might go into detail concerning other discourses, where error and arrogance appear to me combined. But, not to be tedious,—in general I must complain that Jesus purposely adopted an enigmatical and pretentious style of teaching, unintelligible to his hearers, and needing explanation in private. That this was his systematic procedure, I believe because, in spite of the great contrast of the fourth gospel to the others, it has this peculiarity in common with them. Christian divines are used to tell us that this mode was *peculiarly instructive* to the vulgar of Judæa; and they insist on the great wisdom displayed in his choice of the lucid parabolical style. But in Matth. xiii. 10-15, Jesus is made confidentially to avow precisely the opposite reason, viz. that he desires the vulgar *not* to understand him, but only the select few to whom he gives private explanations. I confess I believe the Evangelist rather than the modern Divine. I cannot conceive how so strange a notion could ever have possessed the companions of Jesus, if it had not been true. If really this parabolical method had been peculiarly intelligible, what could make them imagine the contrary? Unless they found it very obscure themselves, whence came the idea that it was obscure to the multitude? As a fact, it *is* very obscure, to this day. There is much that I most imperfectly understand, owing to unexplained metaphor: as: "Agree with thine adversary quickly, &c. &c.:" Whoso calls his brother* a fool, is in danger of hell fire:" "Every one must be salted with fire, and every sacrifice salted with salt. Have salt in yourselves, and be at peace with one another." Now every man of original and singular genius has his own forms of thought; in so far as they are natural, we must not complain, if to us they are obscure. But the moment *affectation* comes in, they no longer are reconcilable with the perfect character: they indicate vanity, and incipient sacerdotalism. The distinct notice that Jesus avoided to expound his parables to the multitude, and made this a boon to the privileged few; and that without a parable he spake not to the multitude; and the pious explanation, that this was a fulfilment of Prophecy, "I will open my mouth in parables, I will utter dark sayings on the harp," persuade me that the impression of the disciples was a deep reality. And it is in entire keeping with the general narrative, which shows in him so much of mystical assumption. Strip the parables of the imagery, and you find that sometimes one thought has been dished up four or five times, and generally, that an idea is dressed into sacred grandeur. This

* I am acquainted with the interpretation, that the word "More" is not here Greek. *i. e*, *fool*, but is Hebrew, and means *rebel*, which is stronger than "Raca," *silly fellow*. This gives partial, but only partial relief.

mystical method made a little wisdom go a great way with the multitude; and to such a mode of economizing resources the instinct of the uneducated man betakes itself, when he is claiming to act a part for which he is imperfectly prepared.

It is common with orthodox Christians to take for granted, that unbelief of Jesus was a sin, and belief a merit, at a time when no rational grounds of belief were as yet public. Certainly, whoever asks questions with a view to *prove* Jesus, is spoken of vituperatingly in the gospels; and it does appear to me that the prevalent Christian belief is a true echo of Jesus's own feeling. He disliked being put to the proof. Instead of rejoicing in it, as a true and upright man ought,—instead of blaming those who accept his pretensions on too slight grounds,—instead of encouraging full inquiry and giving frank explanations, he resents doubt, shuns everything that will test him, is very obscure as to his own pretensions, (so as to need probing and positive questions, whether he *does* or *does not* profess to be Messiah,) and yet is delighted at all easy belief. When asked for miracles, he sighs and groans at the unreasonableness of it; yet does not honestly and plainly renounce pretension to miracle, as Mr. Martineau would, but leaves room for credit to himself for as many miracles, as the credulous are willing to impute to him. It is possible that here the narrative is unjust to his memory. So far from being the picture of perfection, it sometimes seems to me the picture of a conscious and wilful impostor. His general character is too high for *this*; and I therefore make deductions from the account. Still, I do not see how the present narrative could have grown up, if he had been realy simple and straight-forward, and not perverted by his essentially false position. Enigma and mist seem to be his element; and when I find his high satisfaction at all personal recognition and bowing before his individuality, I almost doubt whether, if one wished to draw the character of a vain and vacillating pretender, it would be possible to draw anything more to the purpose than this. His general rule (before a certain date) is, to be cautious in public, but bold in private to the favoured few. I cannot think that such a character, appearing now, would seem to my friend a perfect model of a man.

No precept bears on its face clearer marks of coming from the genuine Jesus, than that of *selling all and following him.* This was his original call to his disciples. It was enunciated authoritatively on various occasions. It is incorporated with precepts of perpetual obligation, in such a way, that we cannot without the greatest violence pretend that he did not intend it as a precept* to *all* his disciples. In Luke xii. 22-40, he addresses the disciples collectively against Avarice; and a part of the discourse is: "Fear not, little flock; for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. *Sell that ye have and give alms*: provide yourselves bags that wax not old; a treasure in the heavens that faileth not, &c. . . . . Let your loins be girded about, and your lights burning," &c. To say that he was not intending to teach a universal morality,† is to admit that his precepts are a trap; for they then mix up and confound mere contingent duties with universal sacred obligations, enunciating all in the same breath, and with the same solemnity. I cannot think that Jesus intended any separation. In fact, when a rich young man asked of him what he should do, that he might inherit eternal life, and pleaded that he had kept the ten commandments, but felt that to be insufficient, Jesus said unto him: "*If thou wilt be perfect,* go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven:" so that the duty was not contingent upon the peculiarity of a man possessing apostolic gifts, but was with Jesus the normal path for all who desired perfection. When the young man went away sorrowing, Jesus moralized on it, saying: "How hardly shall a rich man enter into the kingdom of heaven:" which again shows, that an abrupt renunciation of wealth was to be the general and ordinary method of entering the kingdom. Hereupon, when the disciples asked: "Lo! we *have* forsaken all, and followed thee: what shall we have *therefore*?" Jesus, instead of rebuking their self-righteousness, promised them as a reward, that they should sit upon twelve* thrones, judging the twelve tribes of Israel. A precept thus systematically enforced, is illustrated by the practice, not only of the twelve, but apparently of the seventy, and what is stronger still, by the practice of the five thousand disciples after the celebrated days of the first Pentecost. There was no longer a Jesus on earth to itinerate with, yet the disciples in the fervour of first love obeyed his precept: the rich sold their possessions, and laid the price at the apostle's feet.

The mischiefs inherent in such a precept rapidly showed themselves, and good sense corrected the error. But this very fact proves

---

* Indeed we have in Luke vi. 20-24, a version of the Beatitudes so much in harmony with this lower doctrine, as to make it an open question, whether the version in Matth. v. is not an improvement upon Jesus, introduced by the purer sense of the collective church. In Luke, he does not bless the poor *in spirit*, and those who hunger *after righteousness*, but absolutely the "poor" and the "hungry," and all who honour *Him*; and in contrast, curses *the rich* and those who are full.

† At the close, is the parable about the absent master of a house; and Peter asks, "Lord! (Sir!) speakest thou this parable unto *us*, or also unto *all*?" Who would not have hoped an ingenuous reply, "To you only," or, "To every body"? Instead of which, so inveterate is his tendency to muffle up the simplest things in mystery, he replies, "Who then is that faithful and wise steward," &c., &c., and entirely evades reply to the very natural question.

* This implied that Judas, as one of the twelve, had earned the heavenly throne by the price of earthly goods.

most emphatically that the precept was pre-apostolic, and came from the genuine Jesus; otherwise it could never have found its way into the gospels. It is undeniable, that the first disciples, by whose tradition alone we have any record of what Jesus taught, understood him to deliver this precept to *all* who desired to enter into the kingdom of heaven,—all who desired to be perfect. why then are we to refuse belief, and remould the precepts of Jesus till they please our own morality? This is not the way to learn historical fact.

That to inculcate religious beggary as the *only* form and mode of spiritual perfection, is fanatical and mischievous, even the church of Rome will admit. Protestants universally reject it as a deplorable absurdity;—not merely wealthy bishops, squires and merchants, but the poorest curate also. A man could not preach such doctrine in a Protestant pulpit without incurring deep reprobation and contempt; but when preached by Jesus, it is extolled as divine wisdom,—and disobeyed.

Now I cannot look on this as a pure intellectual error, consistent with moral perfection. A deep mistake as to the nature of such perfection seems to me inherent in the precept itself; a mistake which indicates a moral unsoundness. The conduct of Jesus to the rich young man appears to me a melancholy exhibition of perverse doctrine, under an ostentation of superior wisdom. The young man asked for bread, and Jesus gave him a stone. Justly he went away sorrowful, at receiving a reply which his conscience rejected as false and foolish. But this is not all. Jesus was necessarily on trial, when any one, however sincere, came to ask questions so deeply probing the quality of his wisdom as this: "How may I be perfect?" and to be on trial was always disagreeable to him. He first gave the reply, "Keep the commandments;" and if the young man had been satisfied, and had gone away, it appears that Jesus would have been glad to be rid of him: for his tone is magisterial, decisive and final. This, I confess, suggests to me, that the aim of Jesus was not so much to *enlighten* the young man, as to stop his mouth, and keep up his own ostentation of omniscience. Had he desired to enlighten him, surely no mere dry dogmatic command was needed, but an intelligent guidance of a willing and trusting soul. I do not pretend to certain knowledge in these matters. Even when we hear the tones of voice and watch the features, we often mistake. We have no such means here of checking the narrative. But the best general result which I can draw from the imperfect materials, is what I have said.

After the merit of "selling all and following Jesus," a second merit, not small, was, to receive those whom he sent. In Matt. x., we read that he sends out his twelve disciples, (also seventy in Luke,) men at that time in a very low state of religious development,—men who did not themselves know what the Kingdom of Heaven meant,—to deliver in every village and town a mere formula of words: "Repent ye: for the Kingdom of Heaven is at hand." They were ordered to go without money, scrip or cloak, but to live on religious alms; and it is added,—that if any house or city does not receive them, *it shall be more tolerable for Sodom and Gomorrha in the day of judgment* than for it. He adds, v., 40: "He that receiveth *you*, receiveth *me*, and he that receiveth *me*, receiveth HIM that sent me."—I quite admit, that in all probability it was (on the whole) the more pious part of Israel which was likely to receive this ignorant missionaries; but inasmuch as they had no claims whatever, intrinsic or extrinsic, to reverence, it appears to me a very extravagant and fanatical sentiment thus emphatically to couple the favour or wrath of God with their reception or rejection.

A third, yet greater merit in the eyes of Jesus, was, to acknowledge him as the Messiah predicted by the prophets, which he was not, according to my friend. According to Matthew (xvi. 13), Jesus put leading questions to the disciples in order to elicit, a confession of his Messiahship, and emphatically blessed Simon for making the avowal which he desired; but instantly forbade them to tell the great secret to any one. Unless this is to be discarded as fiction, Jesus, although to his disciples in secret he confidently assumed Messianic pretensions, had a just inward misgiving, which accounts both for his elation at Simon's avowal, and for his prohibition to publish it.

In admitting that Jesus was not the Messiah of the prophets, my friend says, that if Jesus were *less* than Messiah, we can reverence him no longer; but that he was *more* than Messiah. This is to me unintelligible. The Messiah whom he claimed to be, was not only the son of David, celebrated in the prophets, but emphatically the Son of Man of Daniel vii., who shall come in the clouds of heaven, to take dominion, glory and kingdom, that all people, nations and languages shall serve him,—an everlasting kingdom, which shall not pass away. How Jesus himself interprets his supremacy, as Son of Man, in Matt. x., xxiii., xxv., and elsewhere, I have already observed. To claim such a character, seems to me like plunging from a pinnacle of the temple. If miraculous power holds him up and makes good his daring, he is more than man; but if otherwise, to have failed will break all his bones. I can no longer give the same human reverence as before to one who has been seduced into vanity so egregious; and I feel assured *a priori* that such presumption *must have* entangled him into evasions and insincerities, which *naturally* end in crookedness of conscience and real imposture, however noble a man's commencement, and however unshrinking his sacrifices of goods and ease and life.

The time arrived at last, when Jesus felt that he must publicly assert Messiahship; and this was certain to bring things to an issue. I suppose him to have hoped that he was Messiah, until hope and the encouragement given him by Peter and others grew into a persuasion strong enough to act upon, but not always strong enough to still misgivings. I say, I suppose this; but I build nothing on my suppositon. I however see, that when he had resolved to claim Messiahship publicly, one of two results was inevitable, *if* that claim was ill-founded:—viz., either he must have become an impostor, in order to screen his weakness; or, he must have retracted his pretensions amid much humiliation, and have retired into privacy to learn sober wisdom. From these alternatives *there was escape only by death*, and upon death Jesus purposely rushed.

All Christendom has always believed that the death of Jesus was *voluntarily* incurred; and unless no man ever became a wilful martyr, I cannot conceive why we are to doubt the fact concerning Jesus. When he resolved to go up to Jerusalem, he was warned by his disciples of the danger; but so far was he from being blind to it, that he distinctly announced to them that he knew he should suffer in Jerusalem the shameful death of a malefactor. On his arrival in the suburbs, his first act was, ostentatiously to ride into the city on an ass's colt in the midst of the acclamations of the multitude, in order to exhibit himself as having a just right to the throne of David. Thus he gave a handle to imputations of intended treason.—He next entered the temple courts, where doves and lambs were sold for sacrifice, and—(I must say it to my friend's amusement, and in defiance of his kind but keen ridicule,) committed a breach of the peace by flogging with a whip those who trafficked in the area. By such conduct he undoubtedly made himself liable to legal punishment, and probably might have been publicly scourged for it, had the rulers chosen to moderate their vengeance. But he "meant to be prosecuted for treason, not for felony," to use the words of a modern offender. He therefore commenced the most exasperating attacks on all the powerful, calling them hypocrites and whited sepulchres and vipers' brood; and denouncing upon them the "condemnation of hell." He was successful. He had both enraged the rulers up to the point of thirsting for his life, and given colour to the charge of political rebellion. He resolved to die: and he died. Had his enemies contemptuously let him live, he would have been forced to act the part of Jewish Messiah, or renounce Messiahship.

If any one holds Jesus to be not amenable to the laws of human morality, I am not now reasoning with such a one. But if any one claims for him a human perfection, then I say that his conduct on this occasion was neither laudable nor justifiable; far otherwise. There are cases in which life may be thrown away for a great cause; as when a leader in battle rushes upon certain death, in order to animate his own men; but the case before us has no similarity to that. If our accounts are not wholly false, Jesus knowingly and purposely exasperated the rulers into a great crime,—the crime of taking his life from personal resentment. His inflammatory addresses to the multitude have been defended as follows:

"The prophetic Spirit is sometimes oblivious of the rules of the drawing-room; and inspired Conscience, like the inspiring God, seeing a hypocrite, will take the liberty to say so, and act accordingly. Are the superficial amenities, the soothing fictions, the smotherings of the burning heart, ... really paramount in this world, and never to give way? and when a soul of *power, unable to refrain*, rubs off, though it be with rasping words, all the varnish from rottenness and lies, is he to be tried in our courts of compliment for a misdemeanor? Is there never a higher duty than that of either pitying or converting guilty men,—the duty of publicly exposing them? of awakening the popular conscience, and sweeping away the conventional timidities, for a severe return to truth and reality? No rule of morals can be recognized as just, which prohibits conformity of human speech to fact, and insists on terms of civility being kept with all manner of iniquity."

I certainly have not appealed to any conventional morality of drawing-room compliment, but to the highest and purest principles which I know; and I lament to find my judgment so extremely in opposition. To me it seems that *inability to refrain* shows weakness, not *power*, of soul, and that nothing is easier than to give vent to violent invective against bad rulers. The last sentence quoted, seems to say, that the speaking of Truth is never to be condemned: but I cannot agree to this. When Truth will only exasperate, and cannot do good, silence is imperative. A man who reproaches an armed tyrant in words too plain, does but excite him to murder; and the shocking thing is, that this seems to have been the express object of Jesus. No good result could be reasonably expected. Publicly to call men in authority by names of intense insult, the writer of the above distinctly sees will never convert them; but he thinks it was adapted to awaken the popular conscience. Alas! it needs no divine prophet to inflame a multitude against the avarice, hypocrisy, and oppression of rulers, nor any deep inspiration of conscience in the multitude to be wide awake on that point themselves. A Publius Clodius or a Cleon will do that work as efficiently as a Jesus; nor does it appear that the poor are made better by hearing invectives against the rich and powerful. If Jesus had been aiming, in a good cause, to excite rebellion, the mode of address which he assumed seems highly appropriate; and in such a calamitous necessity, to risk exciting murderous enmity would be the act of a hero: but as the account stands, it seems to me the

deed of a fanatic. And it is to me manifest that he overdid his attack, and failed to command it to the conscience of his hearers. For up to this point the multitude was in his favour. He was notoriously so acceptable to the many, as to alarm the rulers; indeed the belief of his popularity had shielded him from prosecution. But after this fierce address he has no more popular support. At his public trial the vast majority judge him to deserve punishment, and prefer to ask free forgiveness for Barabbas, a bandit who was in prison for murder. We moderns, nursed in an arbitrary belief concerning these events, drink in with our first milk the assumption that Jesus alone was guiltless, and all the other actors in this sad affair inexcusably guilty. Let no one imagine that I defend for a moment the cruel punishment which raw resentment inflicted on him. But though the rulers felt the rage of Vengeance, the people, who had suffered no personal wrong, were moved only by ill-measured Indignation. The multitude love to hear the powerful exposed and reproached, up to a certain limit; but if reproach go clearly beyond all that they feel to be deserved, a violent sentiment reacts on the head of the reviler: and though popular indignation (even when free from the element of selfishness) ill fixes the due *measure* of Punishment, I have a strong belief that it is righteous, when it pronounces the verdict Guilty.

Does my friend deny that the death of Jesus was wilfully incurred? The "orthodox" not merely admit, but maintain it. Their creed justifies it by the doctrine, that his death was a "sacrifice" so pleasing to God, as to expiate the sins of the world. This honestly meets the objections to self-destruction; for how better could life be used, than by laying it down for such a prize? But besides all other difficulties in the very idea of atonement, the orthodox creed startles us by the incredible conception, that a voluntary sacrifice of life should be unacceptable to God, unless offered by ferocious and impious hands. If Jesus had "authority from the Father to lay down his life," was he unable to stab himself in the desert, or on the sacred altar of the Temple, without involving guilt to any human being? Did He, who is at once "High Priest" and Victim, when "offering up himself" and "presenting his own blood unto God," need any justification for using the sacrificial knife? The orthodox view more clearly and unshrinkingly avows, that Jesus deliberately goaded the wicked rulers into the deeper wickedness of murdering him; but on my friend's view, that Jesus was *no* sacrifice, but only a Model man, his death is an unrelieved calamity. Nothing but a long and complete life could possibly test the fact of his perfection; and the longer he lived, the better for the world.

In entire consistency with his previous determination to die, Jesus, when arraigned, refused to rebut accusation, and behaved as one pleading Guilty. He was accused of saying that if they destroyed the temple, he would rebuild it in three days; but how this was to the purpose, the evangelists who name it do not make clear. The fourth however (without intending so to do) explains it; and I therefore am disposed to believe his statement, though I put no faith in his long discourses. It appears (John ii. 18—20) that Jesus after scourging the people out of the temple-court, was asked for a sign to justify his assuming so very unusual authority: on which he replied: "Destroy this temple, and in three days I will raise it up." Such a reply was regarded as a manifest evasion; since he was sure that they would not pull the temple down in order to try whether he could raise it up miraculously. Now if Jesus really meant what the fourth gospel says he meant; —if he "spoke of *the temple of his body*;"— how was any one to guess that? It cannot be denied, that such a reply, *prima facie*, suggested, that he was a wilful impostor: was it not then his obvious duty, when this accusation was brought against him, to explain that his words had been mystical and had been misunderstood? The form of the imputation in Mark xiv. 58, would make it possible to imagine,—if the *three days* were left out, and if his words were *not* said in reply to the demand of a sign,—that Jesus had merely avowed that though the outward Jewish temple were to be destryed, he would erect a church of worshippers as a spiritual temple. If so, "John" has grossly misrepresented him, and then obtruded a very far-fetched explanation. But whatever was the meaning of Jesus, if it was honest, I think he was bound to explain it; and not leave a suspicion of imposture to rankle in men's minds.* Finally, if the whole were fiction, and he never uttered such words, then it was his duty to deny them, and not remain dumb like a sheep before its hearers.

After he had confirmed by his silence the belief that he had used a dishonest evasion indicative of consciousness that he was no real Messiah, he suddenly burst out with a full reply to the High Priest's question; and avowed that he *was* the Messiah, the Son of God; and that they should hereafter see him sitting on the right-hand of power, and coming in the clouds of heaven,—of course to enter into judgment on them all. I am the less surprized that this precipitated his condemnation, since he himself seems to have designed precisely that result. The exasperation which he had succeeded in kindling led to his cruel death; and when men's minds had cooled, natural horror possessed them for such a retribution on such a man. His *words* had been met with *deeds*: the provocation he had given was unfelt to those beyond the limits of Jeru-

* If the account in John is not wholly false, I think the reply in every case discreditable. If literal, it all but indicates wilful imposture. If mystical, it is disingenuously evasive; and it tended, not to instruct, but to irritate, and to move suspicion and contempt. Is this the course for a religious teacher ?—to speak darkly, so as to mislead and prejudice; and this, when he represents it as a matter of spiritual life and death to accept his teaching and his supremacy?

salem; and to the Jews who assembled from distant parts at the feast of Pentecost he was nothing but the image of a sainted martyr.

I have given more than enough indications of points in which the conduct of Jesus does not seem to me to have been that of a perfect man: how any one can think him a Universal Model, is to me still less intelligible. I might say much more on this subject. But I will merely add, that when my friend gives the weight of his noble testimony to the Perfection of Jesus, I think it is due to himself and to us that he should make clear what he means by this word "Jesus." He ought to publish—(I say it in deep seriousness, not sarcastically)—an expurgated gospel; for in truth I do not know how much of what I have now adduced from the gospel as *fact*, he will admit to be fact. I neglect, he tells me, "a higher moral criticism," which, if I rightly understand, would explode, as evidently unworthy of Jesus, many of the representations pervading the gospels: as, that Jesus claimed to be an oracular teacher, and attached spiritual life or death to belief or disbelief in this claim. My friend says, it is beyond all serious question *what* Jesus *was*: but his disbelief of the narrative seems to be so much wider than mine, as to leave me more uncertain than ever about it. If he will strike out of the gospels all that he disbelieves, and so enable me to understand *what* is the Jesus whom he reveres, I have so deep a sense of his moral and critical powers, that I am fully prepared to expect that he may remove many of my prejudices and relieve my objections: but I cannot honestly say that I see the least probability of his altering my conviction, that in *consistency* of goodness Jesus fell far below vast numbers of his unhonoured disciples.

F. W. NEWMAN.

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের

কার্য্যনির্ব্বাহার্থে

১৭৮৮ শকের জন্য নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত হইলেন।

অধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত বাবু কাশীশ্বর মিত্র
শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী

বিজ্ঞাপন

১—১৭৮৬ শকের ১ পৌষ অবধি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে যে সকল দান সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্মধর্ম্মের উপকারার্থে ব্যয় করিবার ভার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর মিত্র ও শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী এই তিন জনের উপর সমর্পিত হয়, ইহাঁদের অধিকাংশের মতে উহা ব্যয়িত হইবে।

২—ভবিষ্যতে কেহ বিশেষ নির্দ্দেশ না করিয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে যাহা কিছু দান করিবেন, উপরোক্ত মহাশয়েরাই ব্রাহ্মসমাজের উপকারার্থে তাহা ব্যয় করিবেন।

৩—উপরোক্ত তিন জনের মধ্যে কেহ অবসৃত হইলে যাঁহারা অবশিষ্ট থাকিবেন, তাঁহারা তৎপদে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

১ বৈশাখ }
১৭৮৭ শক }

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীবিজয়গোপাল মিত্র
শ্রীহরিদাস শ্রীমাণি
শ্রীরাজকুমার মল্লিক
শ্রীতারকনাথ দত্ত
শ্রীবিহারিলাল ভট্টাচার্য্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরে ঘাটা)
শ্রীহরনাথ ঠাকুর
শ্রীচন্দ্রকুমার দত্ত
শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীরাজারাম মুখোপাধ্যায়
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীপার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীবনমালি সেন
শ্রীবলরাম দে
শ্রীরামসেবক দে
শ্রীরামমোহন দে
শ্রীসাগরলাল দত্ত
শ্রীকমলাকান্ত সেন
শ্রীসুবলদাস সেন
শ্রীহরিমোহন নন্দী
শ্রীশিবচন্দ্র নন্দী
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীঅভয়াচরণ গুপ্ত
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীসারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীবিশ্বেশ্বর ঘোষ
শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ

বিজ্ঞাপন।

নূতন ও পুনর্ম্মুদ্রিত বিক্রেয় পুস্তক।

তাৎপর্য্যসহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম-মূল্য ১।০

গত বৎসর সাম্বৎসরিক সমাজের দিবস যে পুস্তক লাল কালো অক্ষরে উভয় খণ্ড একত্রে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে পুনর্ব্বার মুদ্রিত করা হইয়াছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

প্রথম প্রকরণ—মূল্য ।।০ আট আনা।

দ্বিতীয় প্রকরণ—মূল্য ।।০ আট আনা।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের এক একটী শ্লোকের যেরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা সাধারণকে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার কতকগুলি লইয়া প্রথম প্রকরণ নামে পূর্ব্বে পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়, সম্প্রতি তাহার অবশিষ্ট গুলি একত্রিত করিয়া দ্বিতীয় প্রকরণ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকরণে পারলৌকিক সাধনের বিশেষ উল্লেখ আছে।

ব্রহ্মোপাসনা—মূল্য ৴০ একআনা

ব্রাহ্মসমাজে সাপ্তাহিক উপাসনা কালে যে পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তৎসমুদায় সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে ব্রাহ্মদিগের ব্রহ্মোপাসনার বিশেষ সাহায্য হইতে পারিবে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস-মূল্য।।০

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় কলিকাতা ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ১৭৮১।৮২ শকে যে দশ উপদেশ দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ব্যক্ত করেন, তাহা গ্রন্থবদ্ধ হইয়া পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা নিঃশেষিত হওয়াতে পুনর্ব্বার মুদ্রিত হইয়াছে।

ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ।

মূল্য ।০ চারি আনা।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে যে কয়েকটী উপদেশ দ্বারা তথাকার ছাত্রদিগের অন্তঃকরণে ব্রাহ্মধর্ম্মের নিগূঢ় ভাব সকল সহজ রূপে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই সকল উপদেশ একত্রিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রচার করা হইয়াছে।

মাঘোৎসব—মূল্য ১ এক টাকা।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রথমাবধি গত বৎসর পর্য্যন্ত সাম্বৎসরিক সমাজের উৎসবে যে সকল বক্তৃতা হইয়াছিল, তৎসমুদায় একত্রিত করিয়া সর্ব্বসাধারণের মুলভার্থে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করা হইয়াছে। যে সকল মহাত্মারা সাম্বৎসরিক উৎসবের বিবরণ একত্রে অবগত হইতে বাসনা করেন, তাঁহারা ঐ পুস্তকে তাহার সমুদয় দেখিতে পাইবেন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের

১৭৮৭ শকের চৈত্র মাসের

আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২০২ ৶০
যন্ত্রালয়	১২২৷৷৶১০
পুস্তক বিক্রয়	৬৮৷৷৵০
ডাক মাসুল	১১।১০
পুস্তক পাঠ	৬৷৷০
দান	২৫
পুস্তক বিক্রয়ের কমিশন	১০৸৶১০
গচ্ছিত	৩১৫।৵০
	৭৭০।৶১০

ব্যয়

পত্রিকা মুদ্রাঙ্কন ও কাগচ ক্রয়	১৫৭৷৵১০
মাসিক বেতন	১৪০৷৶০
যন্ত্রালয়	২৫১৸১০
ডাক মাসুল	২০৷৶১০
আলোকের ব্যয়	৩৮৷৵১০
পুস্তক মুদ্রাঙ্কন	৬৪
পুস্তক বন্ধন	১১৴০
বিবিধ ব্যয়	৩৪৷১৫
গচ্ছিত	৫২৸১০
	৭৭১৵৫

আয়	৭৭০৷৵১০
পূর্ব্বকার স্থিত	৬৯৷৴৫
	৮৩৯৷৶১৫
ব্যয়	৭৭১ ৵৫
স্থিত	৬৮৷৴১০

শ্রী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

সম্পাদক।

১৭৮৭ শকের চৈত্র মাসের দানের

আয় ব্যয় বিবরণ।

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ	১০
" মধুসূদন ঘোষ	৬৷০
" কাশীশ্বর মিত্র	৫
" প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ..	৩
" গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	২
	২৬৷০
দানাধারে প্রাপ্ত	১৷১৫
	২৭৷১৫

আয়	২৭৷১৫
পূর্ব্বকার স্থিত ..] ..	১২২৷৵১৫
	১৪৯৸৶১০

ব্যয়

আগরা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত জন্য পাঠান ব্যয়	
কোং	১০০
	৪৯৸৶১০

শ্রী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ১৭৮৮ শকের অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহাদিগের নিকট তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বাদশ মাসের মূল্য অনাদায় আছে, তাঁহারা জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে তৎ সমুদায় অনুগ্রহ করিয়া পরিশোধ করিবেন।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

সহকারী সম্পাদক।

আগামী ৭ জ্যৈষ্ঠ রবি বার প্রাতঃকালে ৭৷০ সাড়ে সাত ঘণ্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা পুস্তকাকারে প্রকাশ জন্য মুদ্রিত হইতেছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সার মর্ম্ম ইংরেজীতে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। হয়ত গ্রাহকগণ এক কালে উক্ত দুইখানি পুস্তক প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রী ঈশানচন্দ্র বসু

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৩। কলিগতাব্দ ৪৯৬৭। ৯ বৈশাখ শনিবার।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদসংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য ত্রয়োদশানুবাকে অষ্টমং সূক্তং।
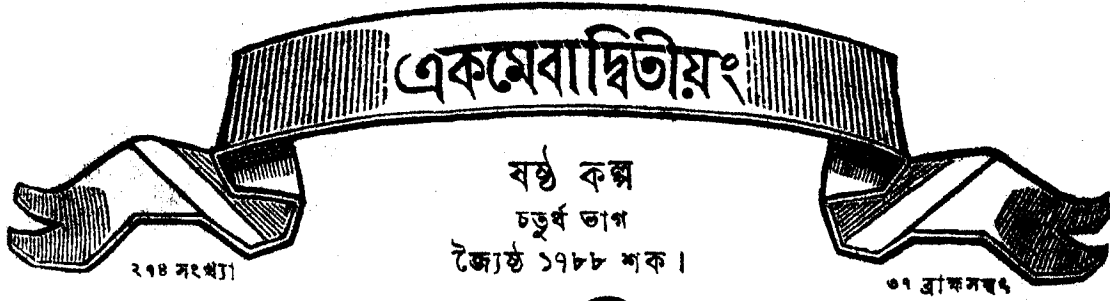
গোতমঋষিঃ পংক্তিচ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

৮৬৪

১ ইন্দ্রো মদায় বাবৃধে শবসে বৃত্রহা নৃভিঃ। তমিন্মহৎস্বাজিষূতেমর্ভে হবামহে সবাজেষু প্রনোঽবিষৎ।

১ 'বৃত্রহা' বৃত্রস্যাবরকস্য বৃষ্টিনিরোধকস্য মেঘস্যাসুরস্য বা হন্তা যদ্বা আবরকাণাং শত্রূণাং হন্তা 'ইন্দ্রঃ' 'মদায়' হর্ষার্থং 'শবসে'। বলনামৈতৎ। বলার্থং চ 'নৃভিঃ' যজ্ঞস্য নেতৃভিঋর্ত্বিগ্‌ভিঃ 'বাবৃধে' স্তোত্রশস্ত্ররূপাভিঃ স্তুতিভিঃ প্রবর্দ্ধিতোবভুব। স্তুত্যাহি দেবতা প্রাপ্তবলা সতী প্রবর্দ্ধতে। 'তমিৎ' তমেবেন্দ্রং 'মহৎসু' প্রভূতেষু 'আজিষু' সংগ্রামেষু 'হবামহে' অস্মাকং রক্ষণায়াহ্বয়ামহে। 'উত' অপিচ 'ইং' এনং 'অর্ভে' অল্পে সংগ্রামে হবামহে। অস্মাভিরাহূতঃ 'সঃ' চেন্দ্রঃ 'বাজেষু' সংগ্রামেষু 'নঃ' অস্মান্ 'প্রাবিষৎ' প্রাবতু প্রকর্ষেণ রক্ষতু।

১ ঋত্বিক্‌গণ বৃত্রহা ইন্দ্রের হর্ষ ও বল বর্দ্ধিত করিয়াছেন। আমরা সেই ইন্দ্রকেই কি ঘোরতর কি স্বল্পতর উভয়বিধ সংগ্রামে আহ্বান করিয়াথাকি। তিনি সংগ্রামে আমাদিগকে সম্যক রূপে রক্ষা করুন।

৮৬৫

২ অসি হি বীর সেন্যোঽসি ভূরি পরাদদিঃ। অসি দভ্রস্য চিদ্বৃধো যজমানায় শিক্ষসি সুন্বতে ভূরি তে বসু।

২ হে 'বীর' শত্রুক্ষেপণকুশলেন্দ্র ত্বং 'সেন্যোঽসি' সেনার্হো ভবসি। ত্বমেকোঽপি সেনাসদৃশোভবসীত্যর্থঃ 'হি' যস্মাদেবং তস্মাৎ 'ভূরি' প্রভূতং শত্রূণাং ধনং 'পরাদদিঃ' পরাদাতা শত্রূণাং পরাঙ্মুখং যথা ভবতি তথা দাতা 'অসি' ভবসি। 'দভ্রস্য চিৎ' অল্পনামৈতৎ। অল্পস্যাপি তব স্তোতুঃ 'বৃধঃ' বর্দ্ধয়িতা 'অসি'। তথা 'যজমানায়' যাগং কুর্ব্বতে 'সুন্বতে' সোমাভিষবং কুর্ব্বতে পুরুষায় 'শিক্ষসি' অপেক্ষিতং ধনং দদাসি। শিক্ষতির্দ্দানকর্ম্মা। যস্মাৎ 'তে' তব 'বসু' ধনং 'ভূরি' বহুলং অক্ষযং ধনং বিদ্যতে তস্মাৎ দদাসীতি ভাবঃ।

২ হে বীর! তুমি একাকী সৈন্যসমষ্টির সমকক্ষ; তুমি শত্রুগণকে বিমুখ করিয়া তাহাদিগকে প্রভূত ধন দান করিয়া থাক। যে তোমাকে অল্পমাত্র স্তব করে, তুমি তাহাকেও সমুন্নত কর; তুমি সোমসংস্কারক যজমানকে তাহার অভিলসিত ধন দিয়া থাক; যে হেতু তোমার ধন যথেষ্ট।

৮৬৬

৩ যদুদীরত আজয়ো ধৃষ্ণবে ধীয়তে ধনা। যুক্ষ্বা মদচ্যুতা হরী কং হনঃ কং বসৌ দধোহস্মাঁ ইন্দ্র বসৌ দধঃ।

৩ অত্রেদমাখ্যানং। রহূগণপুত্রোগোতমঃ কুরুসৃঞ্জযানাং রাজ্ঞাং পুরোহিতআসীৎ। তেষাং রাজ্ঞাং পরৈঃ সহ যুদ্ধে সতি সঋষিরনেন সূক্তেনেন্দ্রং স্তুত্বা স্বকীয়ানাং জয়ং প্রার্থয়ামাসেতি। তস্য চ তৎপুরোহিতত্বং বাজসনেয়িভিরাম্নাতং। গোতমো হবৈ রাহূগণউভয়েষাং কুরুসৃঞ্জযানাং পুরোহিতআসীদিতি। ‘যৎ’ যদা ‘আজয়ঃ’ সংগ্রামাঃ ‘উদীরতে’ উদাচ্ছন্তি উৎপদ্যন্তে তদানীং ‘ধনা’ ধনং ‘ধৃষ্ণবে’ যোধৃষ্ণুর্ধর্ষয়িতা শত্রূণাং জেতা ভবতি তস্মৈ ‘ধীয়তে’ নিধীয়তে জয়তো ধনং ভবতীত্যর্থঃ। হে ‘ইন্দ্র’ ত্বং তাদৃশেষু যুদ্ধেষু প্রবৃত্তেষু ‘মদচ্যুতা’ শত্রূণাম্ মদস্য গর্ব্বস্য চ্যাবয়িতারৌ ‘হরী’ ত্বদীয়াশ্বৌ ‘যুক্ষ্ব’ রথে যোজয়। যোজয়িত্বাচ ‘কং’ কঞ্চিদ্রাজানং তব পরিচরণমকুর্ব্বন্তং ‘হনঃ’ হন্যাঃ ‘কং’ কঞ্চন ত্বাং পরিচরন্তং ‘বসৌ’ বস্তুনি ধনে ‘দধঃ’ স্থাপয়সি। অতোজয়পরাজয়যোস্ত্বমেব কারয়িতাসি। তস্মাৎ হে ইন্দ্র ‘অস্মান্’ অস্মদীয়ান্ রাজ্ঞঃ ‘বসৌ’ ধনে ‘দধঃ’ স্থাপয়।

৩ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে জেতারই ধন লাভ হয়। তুমি শত্রুগণের দর্পহারী অশ্বদ্বয় রথে যোজনা করিয়া কাহাকেও বিনষ্ট কর এবং কাহাকেও ধনদান করিয়াথাক। অতএব হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে ধন প্রদান কর।

৮৬৭

৪ ক্রত্বা মহাঁ অনুষ্বধং ভীম আ বাবৃধে শবঃ। শ্রিয় ঋষ্ব উপাকয়োর্নি শিপ্রী হরিবান্দধে হস্তয়োর্বজ্রমায়সং।

৪ ‘ক্রত্বা’ কর্ম্মণা প্রজ্ঞয়া বা ‘মহান্’ সর্ব্বাধিকঃ ‘ভীমঃ’ শত্রূণাং ভয়ঙ্করঃ ইন্দ্রঃ ‘অনুষ্বধং’। স্বধেত্যন্ননাম। স্বধায়াং। বিভক্ত্যর্থেঽব্যয়ীভাবঃ। সোমলক্ষণস্য অন্নস্য পানে সতীত্যর্থঃ। ‘শবঃ’ আত্মীয়ং বলং ‘আববৃধে’ আভিমুখ্যেন প্রাবর্ধয়ত। তদনন্তরং ‘ঋষ্বঃ’ দর্শণীয়ঃ ‘শিপ্রী’ শিপ্রে হনূ নাসিকে বা তদ্যুক্তঃ ‘হরিবান্’ হরিনামকাশ্বোপেতঃ ইন্দ্রঃ ‘উপাকয়োঃ’ অন্তিকনামৈতৎ সমীপবর্ত্তিণোঃ ‘হস্তয়োঃ’ বাহ্বোঃ ‘আয়সং’ অয়োময়ং ‘বজ্রং’ ‘শ্রিয়ে’ সম্পদর্থং ‘নিদধে’ নিদধাতি স্থাপয়তি। সোমপানেন হৃষ্টঃ প্রবলঃ ইন্দ্রঃ শত্রূণাং হননায় হস্তে বজ্রং গৃহ্নাতীতি তাৎপর্য্যার্থঃ।

৪ কর্ম্মদ্বারা মহান্, শত্রুগণের ভয়ঙ্কর, দর্শনীয়, সুনাসিক, অশ্ববান্ ইন্দ্র সোমরস পান করিয়া বলবান হইয়া স্বীয় হস্তে লৌহময় বজ্র গ্রহণ করেন।

৮৬৮

৫ আ পপ্রৌ পার্থিবং রজো বদ্বধে রোচনা দিবি। ন ত্বাবাঁ ইন্দ্র কশ্চন ন জাতো ন জনিষ্যতে ইতি বিশ্বং ববক্ষিথ।

১।৬।১।

৫ ইন্দ্রঃ স্বতেজসা ‘পার্থিবং’ পৃথিব্যাঃ সম্বন্ধি বস্তুজাতং ‘রজঃ’ অন্তরিক্ষলোকঞ্চ ‘আপপ্রৌ’ আপূরয়তি। তথা ‘দিবি’ দ্যুলোকে ‘রোচণা’ রোচমানানি দীপ্তানি নক্ষত্রাণি ‘বদ্বধে’ ববন্ধ স্থাপিতবান্। অতো হে ইন্দ্র ‘ত্বাবান্’ ত্বৎসদৃশঃ ‘কশ্চনঃ’ ‘ন জাতঃ’ নোৎপন্নোঽস্তি ‘ন’ চ ‘জনিষ্যতে’ উৎপৎস্যমানোঽপি নাস্তি। তাদৃশস্ত্বং ‘বিশ্বং’ সর্ব্বং রক্ষিতব্যং জগৎ ‘অতি’ ‘ববক্ষিথ’ অতিশয়েন বোঢ়মিচ্ছসি। সর্ব্বস্য জগতোনির্ব্বাহকোস্তবসীত্যর্থঃ। ১।৬।১।

৫ ইন্দ্র স্বীয় তেজ দ্বারা পার্থিব বস্তুজাত ও অন্তরিক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া আছেন এবং দ্যুলোকে দীপ্যমান নক্ষত্র সকল বন্ধন করিয়াছেন, অতএব হে ইন্দ্র! তোমার সদৃশ কেহ জন্মে নাই এবং জন্মিবেও না। তুমি সমুদায় জগতের নির্ব্বাহক। ১। ৬। ১।

নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ।

প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

১ বৈশাখ ১৭৮৮ শক।

এক বৎসর কাল পরিবর্ত্ত হইয়া গেল, গত বৎসর অনন্ত-কালে বিলীন হইল; কিন্তু সূর্য্যের রশ্মি যেমন তেমনি রহিল, কিছু মাত্র তাহা মলিন হইল না। অদ্য নব বর্ষ সমুদিত; নব বর্ষের প্রথম সূর্য্য পুন-

বার আমারদের নয়নের আলোক হইয়া উদিত হইয়াছে—এই তরুণ ভানু ঈশ্বরের মহিমা গান করিতে করিতে আবার অদ্য পূর্ব্ববৎ অচেতন জগৎকে সচেতন করিয়াছে, শিশিরার্দ্র পবিত্র পুষ্প-রাজিকে সহস্র বর্ণে রঞ্জিত ও চিত্রিত করিয়াছে। গত বৎসরের সেই পুরাতন সূর্য্য নির্ব্বাণ হয় নাই। যে সূর্য্য বিগত সমস্ত বৎসর আমারদের মস্তকের উপর দিয়া তিন শত পঁয়ষট্টি বার যাতায়াত করিয়াছে; সেই সূর্য্যই অদ্য বৈশাখের প্রথম দিনে উৎসাহ-সহকারে উদিত হইয়াছে, সেই সূর্য্যই গগনে স্বীয় সহস্র কর বিস্তার করিয়া অদ্য বিরাজ করিতেছে। গত বৎসরের গর্ভে এই নূতন বর্ষ ছিল, অদ্য ইহা প্রসূত হইয়াছে—ঈশ্বরের কল্যাণকর নিয়মে ইহা পুরাতন বৎসরকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। যেমন গত বৎসরের গর্ভ হইতে এই নূতন বৎসরের সূর্য্য সমুদিত হইয়াছে, আমারদের আত্মা তেমনি ইহ-কালের জরা-জীর্ণ শরীরের অবসান হইলে পর-কালে পর-লোকে নূতন হইয়া উত্থিত হইবে। সেই মহানাত্মার গর্ভে আমারদের আত্মা প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে—সেই অনির্দ্দেশ্য নিরালম্ব পরমেশ্বরের গর্ভেতে আত্মা পরিপালিত হইতেছে; জরায়ুশায়ী গর্ভেতে মাতৃ-শরীরের রক্ত-সঞ্চারের ন্যায় আমারদের আত্মাতে তাঁর জ্ঞান, তার ধর্ম্ম, তাঁর পবিত্রতা বহমান হইতেছে। এই আত্মা অনন্ত কাল তাঁর আলোকে বিচরণ করিবে। অদ্যকার নূতন দিবসে ঈশ্বর আমারদের শুভ বুদ্ধিতে এই আশাকর উৎসাহকর সত্য প্রেরণ করিতেছেন যে আমারদের আত্মার বিনাশ নাই। তিনি বলিতেছেন—জ্ঞান অর্জ্জন কর, ধর্ম্ম সঞ্চয় কর, পবিত্রতা লাভ কর; আমি তোমাকে ক্রোড়ে লইয়া দিব্য-ধামে গমন করিব। ভয় নাই, লোকের নিষ্ঠুরতাতে কাতর হইও না, আমি তোমার সহায়, আমাকে অবলম্বন কর; এই সংসারের পর-পারে অমৃত-ধামে নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইবে। "ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ।" 'ওঙ্কার প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে ধ্যান কর এবং নির্ব্বিঘ্নে তোমরা অজ্ঞান-তিমিরাবৃত সংসারের পর-পারে উত্তীর্ণ হও।' ঈশ্বর আমারদিগকে এই অঙ্গীকার দিতেছেন—তিনি ক্ষুদ্র মনুষ্যের ন্যায় বিশ্বাসঘাতী নন—তিনি আমারদের আত্মাতে যে বিশ্বাস প্রেরণ করিতেছেন, অবশ্যই তাহা পূর্ণ করিবেন। হে পরমাত্মন্! তুমি প্রতি বৎসর সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই আশা প্রেরণ করিতেছ, যে এই পৃথিবীর শরীর পৃথিবীতে পরিত্যাগ করিয়া আত্মা অনন্ত জীবনে উন্নত হইবে—এ আশা হইতে আর অধিক কিছুই নাই। এই আশা মৃত্যুর মধ্যে জীবন; মৃত্যুর মধ্যে অমৃত। এই আশা না থাকিলে পৃথিবীর কীট হইয়া থাকিতাম; সম্পদে প্রফুল্ল হইতাম না, বিপদ্ ভূমিসাৎ করিত। এই আশা বৎসরে বৎসরে তুমি প্রেরণ করিতেছ—এই আশা জীবনের অন্ন হইয়াছে। এই আশাতে নির্ভয় হইয়া এ সংসারে থাকিয়া 'যে কিছু যাতনা পাই, সব তোমারে জানাই, দুঃখে সুখী হই দুঃখ জানাইয়া'। হে প্রভো! এই আশাতে পৃথিবীর দুঃখে সুখী হই, লোকের অপবাদ তিরস্কার তুচ্ছ করি। তুমি এই আশা আমারদের প্রত্যেকের হৃদয়ে স্বহস্তে রোপণ করিয়াছ, ইহা অবশ্যই ফলবতী হইবে—এই আমার বিশ্বাস।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

কার্ত্তিক ১৭৮৭ শক।

যস্যৈষমহিমা ভুবি দিব্যে।

তাঁহার মহিমা এই ভূলোকে ও দ্যুলোকে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সকল দেশে সকল কালে ও সকল স্থানেই সেই ঈশ্বরের আশ্চর্য্য মহিমা বিদ্যমান রহিয়াছে। কে বা সে মহিমার ইয়ত্তা করিতে পারে? তাঁহার জগতের কার্য্য সমুদায় আলোচনা করিলে কেবল ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার মহিমার আর পার নাই, অন্ত নাই। অদ্যাপি কেহই তাঁহার মহিমার বিষয় আলোচনা করিয়া শেষ করিতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতেও যে কেহ তাহার শেষ করিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার মহিমা সকল স্থানে ও সকল কালে সমান রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার মহিমা যেমন প্রকাণ্ডকায় মাতঙ্গশরীরে প্রকাশমান তেমনি এক ক্ষুদ্র কীটেতেও বর্ত্তমান। গগনমণ্ডলে সূর্য্য চন্দ্র ও অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র যেমন তাঁহার মহিমা ঘোষণা করে তেমনি এক ক্ষুদ্র শিশির বিন্দু ও সুকোমল কুসুমদামও তাঁহার মহিমা পরিব্যক্ত করে। সকল জগৎ ও সকল স্থান তাঁহার স্তুতিরবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। যখন বাত্যাকুলিত মহাসমুদ্র গম্ভীর নির্ঘোষে উত্তাল তরঙ্গ সকল ভীষণ রূপে সমুত্থিত করে তখন সে যেমন ঈশ্বরের মহিমা উচ্চৈঃস্বরে নিনাদিত করে, তেমনি সে যখন পুনরায় শান্তমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক একটি সুবিস্তীর্ণ স্থির পুষ্করিণীর ন্যায় অবস্থিতি করিয়া নীলোজ্জ্বল মনোহর বর্ণে নয়নের প্রীতি উৎপাদন করে তখনও সে তাঁহারি যশঃ ঘোষণা করে। সূর্য্য যখন তাহার পূর্ব্বদিকস্থ গৃহ হইতে উজ্জ্বল লোহিত বর্ণে আকাশমণ্ডলকে ভূষিত করত নির্গত হয়, তখন সে যেমন ঈশ্বরের আশ্চর্য্য মহিমা প্রকাশ করে, সেই রূপ চন্দ্রমা যখন সুকোমল মধুর রশ্মি বিকীর্ণ করত জগৎকে সুধার ধামে পরিণত করে, তখনও সে ঈশ্বরের নিরুপম মহিমার পরিচয় প্রদান করে। ধাতুরাজ্য, উদ্ভিদরাজ্য, পশুরাজ্য, ক্ষুদ্র জগৎ মনুষ্য, দ্যুলোকের উজ্জ্বল ঐশ্বর্য্য, ঈশ্বরের মহিমা অহর্নিশ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে। সকল কালে, সকল স্থানে, সকল ঘটনাতে, সেই ঈশ্বরের অপার মহিমা দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আমাদের কর্ত্তব্য যে আমরা যখন যে বিদ্যা শিক্ষা করি সেই বিদ্যার মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা অবগত হই, যেহেতু সকল বিদ্যাই ঈশ্বরের মহিমা পরিব্যক্ত করে। সকল বিদ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে আমরা তদ্দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা অবগত হইব। যদি ঈশ্বরের মহিমা না জানা যায়, তাহা হইলে সকল বিদ্যাই অর্থশূন্য ও বৃথা হইয়া পড়ে। সকল বিদ্যার চরম গতি তিনি। বিদ্যা দ্বারা যাহা কিছু প্রতিপন্ন হয়, তাহা যদি তাহার সৃষ্টিকর্ত্তাকে স্মরণ না করাইয়া দেয়, তাহা হইলে সে বিদ্যা শিক্ষা করা বিফল। আর যদ্যপি প্রত্যেক বিদ্যা প্রতিক্ষণে সেই ঈশ্বরকে স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহা হইলে সেই বিদ্যা শিক্ষার সময়েই ঈশ্বরের উপাসনা হয় ও সে বিদ্যার আলোচনা সার্থক হয়। একজন বিখ্যাত চিকিৎসক এই কথা বলিয়া গিয়াছেন, যে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষাকালে শবচ্ছেদ সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ হইলে প্রত্যেক শবচ্ছেদই ঈশ্বরের স্তব স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুত সকল বিদ্যাতেই

ঈশ্বরের মহিমা গান অন্তর্ভূত আছে। এক একবার আমার এই রূপ মনে হয় যেন সকল বিদ্যা একত্রিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ঈশ্বরের স্তব করিতেছে। প্রাণিবিদ্যা এই প্রকারে কৃতাঞ্জলিপুটে ঈশ্বরের স্তব করিতেছে;—জয় জয় জগদীশ! তোমার মহিমা কে ব্যক্ত করিয়া শেষ করিতে পারে? কত প্রকার পশুপক্ষীকীট পতঙ্গাদি জীব জন্তু তোমার এই বিশ্বরাজ্যে লালিত পালিত হইতেছে তাহা নিরূপণ করা কাহার সাধ্য? ভীষণমূর্ত্তি সমুদ্র-কম্পনকারী তিমি, ও প্রকাণ্ডকায় মাতঙ্গ এবং অন্যান্য উগ্র ও শান্ত প্রকৃতি কত অসংখ্য জীব তোমার এই জগৎমধ্যে বিচরণ করিতেছে। বিচিত্র বিহঙ্গমকুল এবং কত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কীট পতঙ্গ কেমন স্বচ্ছন্দে ইতস্ততঃ গমন করিয়া তাহাদের মনের আনন্দ ব্যক্ত করিতেছে। জগদীশ! কে তোমার সৃষ্ট প্রাণিপুঞ্জের ইয়ত্তা করিতে সমর্থ হয়? উদ্ভিদ বিদ্যা কৃতাঞ্জলিপুটে এই প্রকারে ঈশ্বরের স্তব করিতেছে; জয় জয় জগদীশ! তোমার মহিমা কি প্রকারে ব্যক্ত করিব? উদ্ভিদরাজ্য ও প্রাণিরাজ্য মধ্যে কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। অসংখ্য প্রকারে ঐ রূপ সম্বন্ধ এমনি নিবদ্ধ আছে যে উদ্ভিদ না থাকিলে প্রাণীদিগের পৃথিবীতে অবস্থিতি করা হইত না। কত প্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য উদ্ভিদ তোমার অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রকাশ করে, তাহা কে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে? এক গহনবৎ প্রতীয়মান অডেন্সিনিয়া বৃক্ষ, কূজনধ্বনি নিনাদিত বহুকুঞ্জনিকুঞ্জকারী বট বৃক্ষ, কুম্ভ বৃক্ষ, পর্য্যটক মিত্র, রোটিক বৃক্ষ, নবনীত বৃক্ষ তোমার আশ্চর্য্য মহিমা প্রকাশ করিতেছে। কত প্রকার উদ্ভিদে তোমার কত অদ্ভুত কীর্ত্তি প্রকাশিত রহিয়াছে; কে তোমার মহিমা বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারিবে? শারীরতত্ত্ব কৃতাঞ্জলি হইয়া এই রূপে ঈশ্বরের স্তব করিতেছে—জয় জয় জগদীশ! তোমার সৃষ্ট এই জীবশরীর কি আশ্চর্য্য কৌশলময়! এই মানবদেহে তুমি কত কৌশল প্রকাশ করিয়াছ! মনুষ্যের শরীরের রক্ত এক স্থান হইতে উদ্গত হইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা দ্বারা কেমন আশ্চর্য্য রূপে সর্ব্ব-শরীরে সঞ্চারিত হয় এবং শরীরস্থ দূষিত পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া কেমন চমৎকার নিয়মানুসারে আর একস্থানে প্রত্যাগত ও শোধিত হইয়া পুনরায় পূর্ব্বের মত কার্য্য করিতে থাকে। কি আশ্চর্য্য নিয়মানুসারে মনুষ্যের পরিপাক ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়! মনুষ্য যে সকল বস্তু আহার করে, সে সকলই একস্থানে প্রবেশ করে এবং পরে সেই সকল নানা প্রকার বস্তু একপ্রকার বস্তুরূপে পরিণত হয়। পরে তাহাহইতে দুগ্ধবৎ এক প্রকার বস্তু নিঃসৃত হইয়া তাহাই অবশেষে রক্ত হয়। সেই রক্ত সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হইয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করে। মস্তিষ্কের সহিত বুদ্ধির কি চমৎকার সম্বন্ধ! মস্তিষ্করূপ যন্ত্র সহকারে বুদ্ধির কার্য্য কি অভাবনীয় সুকৌশলে সম্পন্ন হইয়া থাকে। হে জগদীশ! একমাত্র মনুষ্য-শরীর তোমার যে মহিমা ব্যক্ত করে, তাহারি সমুদায় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া মানব-বুদ্ধির অসাধ্য। ভূতত্ত্ব বিদ্যা কৃতাঞ্জলি পুটে এই রূপে স্তব করিতেছে—জয় জয় জগদীশ! তোমার মহিমা আমি কি প্রকারে প্রকাশ করিব? পৃথিবীর অন্তরস্থ প্রত্যেক স্তরে অবিনশ্বর অক্ষরে তোমার স্তোত্রসূচক গীত লিখিত রহিয়াছে। এই পৃথিবী প্রথমে জ্বলন্ত ও তরল অগ্নিরাশিমাত্র ছিল, তুমি তাহাকে জীবের অবস্থানোপযোগী করিয়া

তুলিলে। প্রথমাবস্থায় যে সকল জীব জন্মিয়াছিল, তাহার বিনাশ হইলে তাহার উপর আর এক স্তর লিখিত হইল। সেই স্তরে পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জীব ও উৎকৃষ্টতর উদ্ভিদের উৎপত্তি হইল। এই রূপে পৃথিবী স্তরে স্তরে রচিত হইতে লাগিল এবং ক্রমশঃ উৎকৃষ্টতর প্রাণীপুঞ্জ ও তাহাদের আহারের উপযোগী উৎকৃষ্টতর উদ্ভিদ সকলের উৎপাদন করিয়া তোমার নূতন নূতন মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। এই রূপে সেই অগ্নিময় পৃথিবী ক্রমে সমুদ্র পর্ব্বত ও গ্রাম নগরে পরিণত হইয়া এক্ষণে মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়াছে; এক্ষণে মনুষ্য ইহার জীবশ্রেণীর শিরোভূষণ স্বরূপ হইয়াছে। হে জগদ্বিধাতা! কি আশ্চর্য্য কৌশলানুসারে এবং কি অচিন্ত্য প্রকারে তুমি পৃথিবীর সৃজন ও ইহার উন্নতি সাধন করিতেছ আমি তাহার কিইবা বর্ণন করিতে সমর্থ হইব? হে জগদীশ! কে তোমার মহিমা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারে? জ্যোতির্ব্বিদ্যা কৃতাঞ্জলি হইয়া এই রূপে ঈশ্বরের স্তুতি করিতেছে—জয় জয় জগদীশ! তোমার মহিমার আর সীমা কোথা? এই অনন্ত আকাশে সূর্য্যের পর সূর্য্য, গ্রহের পর গ্রহ এবং নক্ষত্রের পর নক্ষত্র সমস্বরে তোমারি অপার মহিমার বিষয় উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে। এমন দূরে শুভ্র মেঘের ন্যায় বিশাল জ্যোতিষ্করাশি প্রতিভাত হয়, যাহার পরিমাণ বা সংখ্যা স্থির করা মানব-শক্তির অসাধ্য। যেমন এক রাত্রিতে ক্ষেত্রমধ্যে নূতন নূতন তৃণ সকল প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তেমনি এক রাত্রি মধ্যে কত শত নূতন নূতন গ্রহ নক্ষত্র নভোমণ্ডলে সৃষ্ট হয়। এই সীমাশূন্য আকাশে তোমার বিশ্বরাজ্য যে কত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহার কেবা ইয়ত্তা করিতে সমর্থ হইবে? এই সমুদায় জ্যোতিষ্ক পুঞ্জের মধ্যে কোন কোনটী এই পৃথিবী হইতে এত দূরে সংস্থিত হইয়া আছে যে তাহার কিরণ হয়ত অদ্যাপি এখানে আসিয়া পতিত হইতে পারে নাই। এই দৃশ্যমান জগতের চতুষ্পার্শস্থ গাঢ় তিমির সাগরের পর পারেও তোমার আর এক নূতন জগতের চিহ্ন লক্ষিত হয়। ধন্য হে জগদীশ! ধন্য তোমার কীর্ত্তি এবং ধন্য তোমার মহিমা!

এই রূপে সকল বিদ্যা সমস্বরে সেই বিশ্বাধিপের অনন্ত মহিমার বিষয় চিরকাল ঘোষণা করিয়া আসিতেছে এবং চিরকাল ঘোষণা করিতে থাকিবে। সমস্ত বিদ্যার ইহাই প্রধান গৌরব যে তাহারা ঈশ্বরের গুণগান করে। ব্রহ্মবিদ্যা সকল বিদ্যার পর্য্যাপ্তি ও সকল বিদ্যার শিরোভূষণ স্বরূপ। “ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্ব বিদ্যা প্রতিষ্ঠা।” ব্রহ্মবিদ্যা সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা। যেমন নদীসকল চারিদিক হইতে প্রবাহিত হইয়া এক সাগরে গিয়া মিলিত হয়, সেই রূপ সকল বিদ্যা পরিশেষে এক ব্রহ্মবিদ্যাতে গিয়া পর্য্যাপ্ত হয়। আমাদের কর্ত্তব্য যে আমরা বিদ্যালোচনার সময়ে ঈশ্বরকে সকল সময়ে স্মরণ করি। তিনিই এই সুকৌশলময় বিশ্বরাজ্যের রচয়িতা। আমরা সৃষ্টির তত্ত্ব যাহা কিছু অবগত হই, সে সকলি তাঁহারই অনুপম কীর্ত্তি। সৃষ্টির সকল বস্তু তাহার সৃজন কর্ত্তার গুণ গান করিতে ক্রটি করে না; তাহারা জিহ্বাহীন হইয়াও নিজ নিজ রচয়িতার মহিমা নিরন্তর ঘোষণা করিতেছে। তবে আমরা কেন বিস্মৃত হই? আমরা কেন অকৃতজ্ঞ ও অধম হইয়া থাকি? যিনি আমাদিগকে জ্ঞান দিয়াছেন, বুদ্ধি দিয়াছেন এবং কত প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি দিয়া অন্যান্য জীব-

দিগের হইতে আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ করিয়াদি-য়াছেন, আইস আমরা তাঁহার অনন্ত যশঃ উচ্চৈঃস্বরে অহর্নিশ ঘোষণা করি এবং তাঁ-হার প্রদত্ত আধ্যাত্মিক সুধা পান করিয়া জীবনকে সার্থক করি।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের সকল জ্ঞানের ও সকল বিদ্যার মূল। তুমি যেমন আমাদের জ্ঞানদাতা ও বুদ্ধিদাতা, তেমনি তুমিই আবার আমাদের জ্ঞানের বিষয় ও সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠাভূমি। তোমাকে জানিলে আমাদের আর সকল জ্ঞান সার্থক হয় এবং তোমাকে জানিলেই আমাদের আর সকল জ্ঞান লাভ হয়। তোমার মহিমা এই দ্যুলোক ও ভূলোকে জাজ্জ্বল্য-তর প্রকাশিত রহিয়াছে; যে তোমাকে জানে, তাহার নিকটে সকল বস্তুই তোমার অনন্ত মহিমার পরিচয় প্রদান করে। আহা! সেই ব্যক্তি কি সুখী যে চারি দিকে অবি-নশ্বর অক্ষরে লিখিত তোমার অনন্ত নাম পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। হে অখিল বিশ্বের অধিপতি! তুমি আমাদের এক মাত্র গুরু এবং এক মাত্র জ্ঞানদাতা। তুমি আমাদের হৃদয়ে তোমার আত্ম স্বরূপ প্র-কাশ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

তত্ত্ববিদ্যা।

তৃতীয় অধ্যায়।

শৈশবাবস্থা হইতে মনুষ্যের বয়ঃক্রম যত বৃদ্ধি হয়, ততই বিষয়াকর্ষণ একদিকে প্রবল হয়, আত্মার প্রভাব অপর দিকে উদ্দীপ্ত হয় এবং ক্রমে ক্রমে পরমাত্মার সুমঙ্গল মহিমা সর্ব্বোপরি প্রকাশমান হয়। এক্ষণকার এ অবস্থায় ইন্দ্রিয়-বোধ, বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞা, তি-নকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে অনায়াসে অবধারণ করা যাইতে পারে; কিন্তু কোন অবস্থা-তেই এ রূপ হইতে পারে না যে উহারা পর-স্পরের সহিত একেবারেই সম্পর্ক রহিত। আমাদের যদি ইন্দ্রিয়-বোধ না থাকে, তবে বুদ্ধি মাত্র দ্বারা আমরা কি অবগত হইব? যদি বুদ্ধি না থাকে, তবে ইন্দ্রিয়-বোধ সক-লকে কিরূপে জ্ঞানে আয়ত্ত করিব? যদি প্রজ্ঞা না থাকে, তবে সর্ব্বভুক্ সংশয়-গ্রাস হইতে কিরূপে রক্ষা পাইব? অতএব প্রজ্ঞা, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়-বোধ, ইহারা সকল অব-স্থাতেই এক যোগে কার্য্য করে, কখনই ইহার অন্যথা হয় না। কিন্তু প্রজ্ঞার প-দবী, সকল হইতে উচ্চতম; ইন্দ্রিয় যেখানে যাইতে পারে না, বুদ্ধি যেখানে নিরস্ত হয়, প্রজ্ঞা সেই খানে থাকিয়া বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়-বোধ উভয়কেই নিয়মিত করিতেছে। ইন্দ্রিয়-বোধ এবং বুদ্ধি-ক্রিয়া, উভয়ই কতকগুলি সার্ব্বভৌমিক নিয়মের অধীন এবং প্রজ্ঞা হই-তেই সেই সকল নিয়ম অবতীর্ণ হইতেছে। অতএব এরূপ কখনই নহে যে প্রজ্ঞা, বুদ্ধি প্রভৃতি সকলকে উপেক্ষা করিয়া উদাসীনের ন্যায় উচ্চ প্রদেশে অবস্থান করিতেছে। প্রজ্ঞা যেমন আপন স্বরূপে অবস্থিতি করে, সেই রূপ আবার বুদ্ধির মধ্যেও উহা কার্য্য করে এবং সকলের প্রান্ত-স্থিত ইন্দ্রিয়-বোধ পর্য্যন্তও উহার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এতদনুসারে মূল-তত্ত্ব সক-লকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে—ইন্দ্রিয়-ঘটিত, বুদ্ধি-ঘটিত ও প্রজ্ঞা-ঘটিত। যে কোন মূল তত্ত্ব অনুসারে ই-ন্দ্রিয়-ব্যাপার প্রবৃত্ত হয়, তাহাই ইন্দ্রিয়-ঘটিত মূলতত্ত্ব; যদনুসারে বুদ্ধি-ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই বুদ্ধি-ঘটিত মূলতত্ত্ব; যদনুসারে প্রজ্ঞা আপন স্বরূপে স্থিতি করে, তাহাই প্রজ্ঞা-ঘটিত মূলতত্ত্ব।

ইন্দ্রিয়-ঘটিত মূলতত্ত্ব।

একটা কোন বস্তুকে যখন আমরা ইন্দ্রিয় মাত্র দ্বারা প্রত্যক্ষ করি, তখন এ কথা জিজ্ঞাসা করি না যে ইহা কি রূপে হইয়াছে? কি অবলম্বন করিয়া থাকিতেছে? অন্যান্য ইন্দ্রিয়-বোধের সহিত ইহার সম্বন্ধ কি? কেন না প্রত্যক্ষ বস্তু-বিশেষ ইন্দ্রিয় সমক্ষে আপাততঃ যে রূপ দেখা যায়, তাহা লইয়াই ইন্দ্রিয়ের যাহা কিছু প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত কথিত বস্তু কেমন করিয়া কাহার কর্তৃত্বে ওরূপ দেখাইতেছে, কেমন করিয়া কি প্রকরণ দ্বারা ঘটনা-সকল ঘটিতেছে; ইহার সহিত ইন্দ্রিয়ের কোন সংস্রব নাই। আমি পদ-ব্রজে চলিতেছি— এ স্থলে চলন-রূপ বাহ্য-ব্যাপার বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয় বটে, এবং চলিবার প্রবৃত্তি-রূপ যে এক আন্তরিক অবস্থা, তাহাকে অন্তরিন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণের বিষয় বলিলেও বলা যাইতে পারে; কিন্তু আমি যে আপন কর্তৃত্বে শেষোক্ত প্রবৃত্তি উদ্দীপন করত পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সাধন করিতেছি, ইহা কোন ইন্দ্রিয়েরই গম্য হইতে পারে না। অতএব ইন্দ্রিয়-বোধ যে বিষয়ীর অধিকারবর্ত্তী কিম্বা উহা যে বিষয়-মূলক, ইত্যাদি আন্দোলন-সকল এখানকার কোন অংশেই উপযোগী নহে। পশ্চাতে জানা যাইবে যে বুদ্ধি যখন নানা ইন্দ্রিয়-বোধের মধ্যে কর্তৃত্ব-মূলক কোন না কোন রূপ সম্বন্ধ অবধারণ করিতে যায়, তখনই বিষয়ী এবং বিষয়ের আবশ্যকতা প্রজ্ঞাতে প্রতীয়মান হয়; কিন্তু এক্ষণে জানা আবশ্যক যে কোন একটি ইন্দ্রিয়-বোধ আমারদের সমক্ষে বিচ্ছিন্ন-রূপে সমাগত হইলে—তাহা কি রূপে আইল, তাহার সহিত অন্য ইন্দ্রিয়-বোধের কি রূপ সম্বন্ধ, তাহার মর্ম্ম কি; এ সকল বিষয়ের প্রতি আমরা যত উদাসীন থাকি, ততই ইন্দ্রিয়-বোধকে বুদ্ধি হইতে পৃথক্ রূপে বিবেচনা করিতে যোগ্যতা প্রাপ্ত হই। মনে কর যে রামায়ণের কোন একটি বৃত্তান্ত একটা পটে চিত্রিত রহিয়াছে এবং তাহার নিম্নে বিজ্ঞাপন-স্বরূপ উক্ত চিত্র-রচনার মর্ম্ম লিখিত আছে; এতদবস্থায় এক জন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি উক্ত চিত্র-পট দৃষ্টে উহার কিছুই বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু নিম্নের বিজ্ঞাপন পাঠ করিলে তাহার নিকটে সকলই সুস্পষ্ট হইবে। পূর্ব্বাবস্থায় দর্শকের নয়নে যে কতকগুলি বর্ণময় আকৃতি প্রকাশ পাইতেছিল, তাহাই কেবল ইন্দ্রিয়ের বিষয়; কিন্তু শেষোক্ত অবস্থায় চিত্রকরের মনের ভাবানুসারে উহারদের মধ্যে যে পরস্পর সম্বন্ধ অবধারিত হইল, এই রূপ রচনার আকর হইতে রচনার যে ভাব সংগ্রহ করা হইল, ইহা বুদ্ধি-চালনা ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয় মাত্র দ্বারা কোন রূপেই সম্ভবে না। এই বুদ্ধিকে আপাততঃ সম্বৃত রাখিয়া, এখন কেবল ইন্দ্রিয়-বোধ মাত্র সংঘটন-পক্ষে যে যে মূলতত্ত্ব আবশ্যক, তাহারই প্রতি মনোনিবেশ করা যাইতেছে।

অন্তরের অবস্থা পরিবর্ত্তন এবং বাহিরের স্থান অধিকরণ, এই দুইটি ব্যাপার সকল ইন্দ্রিয়-বোধের সঙ্গেই অবিচ্ছেদ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ণ-বিশেষ দৃষ্ট হইবা মাত্র আমারদের অন্তঃকরণের অবস্থান্তর ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পায় যে উহা বাহিরে স্থিতি করিতেছে; শব্দ বিশেষ শ্রুত হইবা মাত্র ঐ রূপেই অন্তঃকরণের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহা কর্ণ-কুহর-গামী রূপে বহির্দ্দেশে অনুভূত হয়। কাল ব্যতিরেকে অন্তরে পরিবর্ত্তন সম্ভবে না, দেশ ব্যতিরেকে বাহিরে অবস্থান সম্ভবে না; এই হেতু দেশ এবং

কাল এই দুই উপকূলের মধ্যেই তাবৎ ইন্দ্রিয়-ব্যাপার সাধিত হইয়া থাকে।

বহির্বিষয়কে আমরা যদিও দেশ এবং কাল উভয়েতেই প্রত্যক্ষ করি, তথাপি উহার বহির্ভাব যে টুকু, তাহা কেবল দেশেরই প্রসাদাৎ, কালের তাহাতে হস্ত নাই; এবং আমারদের অন্তঃকরণের ব্যাপার যে টুকু, তাহাতে দেশের কোন অধিকার নাই, তাহাতে কেবল কালেরই প্রাদুর্ভাব। এক অনেক, কার্য্য কারণ, ইত্যাদি দ্বন্দ্ব সকল যে রূপ সাম্বন্ধিক, অন্তর বাহির শব্দও সেই রূপ সাম্বন্ধিক; সুতরাং দেশ কালকেও সাম্বন্ধিক বলিতে হইবে। অতএব আমারদের অন্তঃকরণের অবস্থা-সম্বন্ধেই বহির্বিষয় দেশে অবস্থান করে, এবং বহির্বিষয়-সম্বন্ধেই আমারদের অন্তঃকরণের অবস্থা কালে প্রবর্ত্তিত হয়। দেশ কালের সাম্বন্ধিকতা-বিষয়ে স্পষ্ট-রূপে বুঝিতে হইলে গতি-ক্রিয়ার প্রতি এক বার মনোনিবেশ করিলেই তাহাতে কৃত-কার্য্য হইতে পারা যায়। একটা গতিশীল বস্তু যত দ্রুত চলে, দেশ বিশেষে উহা তত অল্পকাল থাকিতে পায় এবং যত মন্দ চলে তত অধিক কাল থাকিতে পায়; এই রূপ দেশ বিশেষে অধিক কাল থাকাতেই আপেক্ষিক স্থিরতা, অল্পকাল থাকাতেই আপেক্ষিক দ্রুততা—সুতরাং বস্তু-সকল যে পরিমাণে দেশ-বিশেষে থাকে, সেই পরিমাণে উহা স্থির থাকে এবং যে পরিমাণে উহা দেশ-বিশেষে বদ্ধ না থাকে, সেই পরিমাণে উহা দ্রুত চলে; অতএব স্থিরতার ভাব মুখ্য-রূপে দেশেরই সহিত সংলগ্ন হয় এবং প্রবাহের ভাব মুখ্য-রূপে কালেরই সহিত সংলগ্ন হয়।

দেশ কালে অবস্থিত বিষয়-সকলকে আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করি বটে; কিন্তু দেশ কাল স্বয়ং আমারদের ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে। আকাশ-স্থিত বায়ুকে আমরা স্পর্শ দ্বারা অবগত হই বটে; কিন্তু সাক্ষাৎ আকাশকে আমরা কদাপি সে রূপে অবগত হইতে পারি না। আকাশ-স্থিত আলোককে আমরা দৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধি করি বটে; কিন্তু সাক্ষাৎ আকাশকে সে রূপ করিয়া কখনই প্রাপ্ত হইতে পারি না। এই রূপ কালবর্ত্তী ঘটনা-প্রবাহকে আমরা অন্তঃকরণে অনুভব করি বটে; কিন্তু শূন্য কালকে আমরা সে রূপে কখনই আয়ত্ত করিতে পারি না—এবং পূর্ব্বে ইহা পুনঃ পুনঃ প্রদর্শিত হইয়াছে যে, অসীম দেশ কালকে আমরা বুদ্ধি দ্বারা উপার্জ্জন করি নাই। কি রূপেই বা করিব? বস্তু-সকলের সীমা-বিশিষ্ট আয়তন হইতে অসীম দেশে আমরা কি প্রকারে নিঃসংশয়-রূপে উপনীত হইব? বুদ্ধি দ্বারা এই পর্য্যন্ত নিশ্চয় হইতে পারে যে, যে সকল ভৌতিক বস্তুকে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাই দেশ ব্যাপিয়া স্থিতি করিতেছে; কিন্তু সমুদায় ভৌতিক বস্তুই যে দেশ ব্যাপিয়া থাকিবে, এ রূপ যৎপরোনাস্তি নিশ্চয় বাণি বুদ্ধির মুখ হইতে কোন রূপেই বাহির হইতে পারে না; সুতরাং উক্ত মূলতত্ত্বটি প্রজ্ঞা হইতেই অবতীর্ণ হইতেছে। অসীম-দেশ-কাল-সম্বন্ধীয় অনিবার্য্য নিশ্চয়তা সাক্ষাৎ পরমাত্মা হইতেই আমারদের আত্মাতে নিঃশ্বসিত হইতেছে; কেন না অন্য কুত্রাপি হইতে ও রূপ হওয়া অসম্ভব।

দীর্ঘ, প্রস্থ, বেধ, এই তিনটি দেশের অবয়ব; ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, এই তিনটি কালের অবয়ব; এবং দেশ কালের সম্বন্ধ-ঘটিত—অথবা অন্তঃকরণ-গোচর দৈহিক

অবস্থা এবং বহিরিন্দ্রিয়-গোচর ভৌতিক আবির্ভাব, এ দুয়ের সম্বন্ধ-ঘটিত—ইন্দ্রিয়-বোধ-সকলের মূলে গতি, বিস্তৃতি এবং ঘনত্ব, এই তিনটি তত্ত্ব অবিচ্ছেদে পাওয়া গিয়া থাকে; ও এই তিনের একটিকে লঙ্ঘন করিয়া কোন বাহ্য বিষয়ই ইন্দ্রিয়-গোচর হইতে পারে না। ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বিস্তৃতি ও ঘনত্ব ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয়ের কোন বিষয়ই যথোচিত পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় না—ইহাও ঐ রূপ সত্য যে গতি ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য বিষয়ের কোন রূপেই সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না। যখন কোন কিছু আমারদের শরীরকে স্পর্শ করে—যখন আলোক চক্ষুতে নিপতিত হয়, শব্দ শ্রবণে আহত হয়, গন্ধ নাসিকায় প্রবেশ করে, রসনাতে আস্বাদের সঞ্চার হয়, ইত্যাদি তাবৎ ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের সঙ্গেই কোন না কোন প্রকার গতি একান্ত আবশ্যক; নতুবা বাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সহিত, দেশের সহিত কালের সহিত, কি রূপে যোগ সম্ভব হইবে? যখন কেবল একটা স্তব্ধ পাষাণকেও আমরা সম্মুখে অবলোকন করি, তখনো আলোকের গতি অনুসারেই আমরা ও রূপ করিতে সমর্থ হইতেছি। যদি এ রূপ মনে করা যায় যে আলোকের সহিত গতির কোন সম্পর্ক নাই; তাহা হইলে তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে আলোক বাহির হইতে অন্তরে নহে, কিন্তু একেবারেই আমাদের অন্তরে কার্য্য করিতেছে—, সুতরাং ও রূপ হইলে উহা যে অন্তর হইতে আসিতেছে না কিন্তু বাহির হইতেই আসিতেছে, এ তথ্যটির বিপর্য্যয় দশা উপস্থিত হয়। অতএব গতি, বাহ্য-বিষয় এবং ইন্দ্রিয়-ব্যাপার এ দুয়ের মধ্যস্থিত সেতু স্বরূপ; সুতরাং ইন্দ্রিয়-ব্যাপার-সম্বন্ধে উহা অলঙ্ঘনীয়, ইহাতে আর সংশয় নাই। গতি-ক্রিয়ার সহিত দেশ কালের এই রূপ সম্বন্ধ যে গতি সমাধা হইতে গেলে কাল অতীত হওয়া চাই এবং দেশ দীর্ঘে লঙ্ঘিত হওয়া চাই; অতএব কালের অতীত অবয়ব এবং দেশের দীর্ঘ অবয়ব, গতি-ক্রিয়াতে এই দুইটি অবয়ব একত্রে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ বিস্তৃতির সহিত দেশ কালের সম্বন্ধ এই রূপ যে, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেই বস্তু-সকলের প্রস্থ-গত বিস্তৃতি উপলব্ধি হইয়া থাকে—এক মুহূর্ত্তের পর অন্য মুহূর্ত্ত, ইত্যাদি ক্রমে কাল অতীত না হইলে যেমন গতি গ্রাহ্য হইতে পারে না, ইহা সে রূপ নহে। অতএব কালের বর্ত্তমান অবয়ব এবং দেশের প্রস্থ অবয়ব, বিস্তৃতির সহিত এই দুইটি অবয়ব একত্রে পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ একটা প্রাচীরকে প্রস্থে বিস্তৃত দেখিয়া তাহার প্রতি আমরা যখন হস্ত ক্ষেপ করি এবং তাহাতে যখন আমারদের হস্তের গতি বাধা প্রাপ্ত হয়; তখন আমরা নিশ্চয়ই অনুমান করি যে উক্ত প্রাচীরের ঘনত্ব আছে। একটা চিত্র-স্থিত প্রাচীর আপাততঃ ঘনরূপে প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু তাহার প্রতি হস্তার্পণ করিবা মাত্র উপযুক্ত বাধা প্রাপ্তির অভাবে উক্ত ভ্রম অমনি সংশোধিত হইয়া যায়; বর্ত্তমান ক্ষণ অতীত হইলেই ভবিষ্যৎ আইসে। অতএব যখন আমরা দেখি যে বস্তু-বিশেষ বর্ত্তমানে বিস্তৃত রহিয়াছে, এবং তদীয় বাধা অতিক্রম করিতে সময় অতীত হইতেছে; তখন উক্ত বস্তুর বেধ-স্থিত পরমাণু-পুঞ্জ যে ভবিষ্যতে অনাবৃত হইতে পারে, ইহাতে আর সংশয় থাকে না। অতএব কালের ভবিষ্যৎ অবয়ব এবং দেশের বেধ অবয়ব ঘনত্বে এই দুইটি একত্রে পাওয়া যায়। যাহা বলা

হইল, তাহা নিম্নের লক্ষ্য দেখিলে স্পষ্ট হইবে।

কাল	দেশ	সম্বন্ধ
ভুত	দীর্ঘ	গতি
বর্ত্তমান্	প্রস্থ	বিস্তৃতি
ভবিষ্যৎ	বেধ	ঘনত্ব

সংস্কৃত সাহিত্য * ।

পূর্ব্বতন মনুষ্যদিগের সহিত ইদানীন্তন মনুষ্যের অবস্থাগত তারতম্য নির্দ্দেশ করাই ভাষাতত্ত্বের এক মাত্র উদ্দেশ্য। আমরা ভাষাতত্ত্বের নিগূঢ় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া সেই মহান্ উদ্দেশ্য সাধনে অধ্যবসায়ারূঢ় হইতেছি। পূর্ব্ব কালে যে সমস্ত গ্রন্থ প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের অসার ভাগ হইতে সার সঙ্কলন করাই এই অধ্যবসায়ের কার্য্য। যদিও আমরা বহুকাল গাঢ়তর পরিশ্রম করিয়া প্রার্থিত ফল লাভে বঞ্চিত হই, যদিও পূর্ব্বতন ভাষা-তত্ত্ব হইতে আদিম বৃত্তান্ত সমুদায় সম্যক্ অবগত হইতে না পারি, তথাচ আমরা কখনই উৎসাহ-শূন্য ও লজ্জিত হইব না। প্রকৃত বিজ্ঞানে কোন বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যদি শূন্য হৃদয়ে প্রতি নিবৃত্ত হই, তাহাও একটি ফল সন্দেহ নাই।

মানব জাতির ইতিবৃত্তের সহিত ভাষাতত্ত্বের সবিশেষ সম্বন্ধ আছে, সুতরাং আমাদিগের অবলম্বিত এই প্রস্তাব ইতিবৃত্তমূলক হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্য অবলম্বন করিয়া আদি হইতে ভারতবর্ষীয়দিগের ক্রমশ উন্নতির বিষয় যতদূর পারা যায়, আবিষ্কৃত করাই আমাদিগের এই প্রস্তাবের অভিপ্রেত। পদার্থ বিদ্যার মত এই যে, যে কোন বিষয় হউক না কেন আমরা তাহার মূল প্রকৃতি ও প্রারম্ভ অগ্রে অনুধাবন করিব; কারণ যখন বস্তুর মূলতত্ত্ব প্রকৃত রূপ অবগত হওয়া যায়, তখন তদ্বিষয়ে আর কোন সংশয়ই উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে না। যাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের ইহা অবশ্যই প্রতীতি হইবে যে, ভারতবর্ষবাসীরা যাহাকে আপনাদিগের ধর্ম্ম-জ্ঞানের মূল বলিয়া স্বীকার করেন, সেই বেদের বিরুদ্ধ কোন শাস্ত্র সঙ্কলিত হইলে তাহা নিতান্ত অগ্রাহ্যেয় হইয়া থাকে। কি ধর্ম্মশাস্ত্র, কি পদার্থ বিজ্ঞান, কি ব্যবস্থা শাস্ত্র, কি জ্যোতিষ্, কি ব্যাকরণ, কি ছন্দোবিজ্ঞান, কোন শাস্ত্রই বেদ-বিরুদ্ধ হইলে তাহা জন-সমাজে আদরের সহিত পরিগণিত ও পরিগৃহীত হয় না। ভাষাতত্ত্বের যদি প্রাকৃতিক ও ইতিবৃত্ত মূলক বিষয় সমূহের অনুসরণ করা উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এক্ষণে বেদকে অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর হইতেছে। বেদ ভারতবর্ষীয় ইতিবৃত্তের উপর এতদূর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে—সাহিত্যের প্রত্যেক অংশ বৈদিক ইতিবৃত্তের সহিত এতদূর সংশ্রব রাখিয়াছে—বেদমূলক ধর্ম্ম ও নীতির ভাব ভারতবর্ষীয়দিগের চিত্ত-ক্ষেত্রে এতদূর বদ্ধমূল হইয়াছে—জীবনের প্রত্যেক বাহ্য ও আন্তরিক কার্য্য এই প্রাচীন ঐতিহাসিক উপদেশ দ্বারা এতদূর পরিচালিত হইতেছে যে, বেদে সম্পূর্ণ অধিকার না থাকিলে ভারতবর্ষীয়দিগের কি ধর্ম্ম, কি নীতি, কি সাহিত্য, কোন বিষয়ই প্রকৃত রূপ বিচার করা নিতান্ত দুষ্কর ও একান্ত অসম্ভব হইয়া থাকে।

যে সমস্ত গ্রন্থে বেদকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সেই সমস্ত গ্রন্থ হইতে ইহাই অনুমিত হইতেছে যে, বেদ শব্দটি একখানি গ্রন্থের প্রতিপাদক নহে। এই বাক্য এক প্রকার সুপ্রমাণ যে বৈদিক সময়ে যে সমস্ত ধর্ম্ম-

* ডক্টর মোক্ষ মূলরের প্রণীত সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক ইতিহাস হইতে সঙ্কলিত।

গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে, তৎসমুদায়েরই নাম বেদ। ঐ সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে অনেকই এক্ষণে এক কালে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এমন কি বোধ হয় তৎকালে তৎসমুদায় লিখিতও হয় নাই। তথাচ এক্ষণে যে সকল গ্রন্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার সংখ্যাও অল্প নহে। বেদ নিতান্ত দুরূহ। টীকার সাহায্য গ্রহণ না করিলে বেদ-মূলক অনেক বিষয়ের মীমাংসা করা অতিশয় দুষ্কর হইয়া উঠে। যাহাই হউক এক্ষণে আমরা বেদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া বেদ কতদূর সপ্রমাণ, কত কাল বেদের সৃষ্টি হইয়াছে এবং কত সময় অন্তর প্রত্যেক বৈদিক গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল, এই সমস্ত বিষয় নিরূপণে প্রবৃত্ত হইলাম। বেদের এমন কতগুলি বিষয় আছে, যাহা নিশ্চয় রূপে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে এবং কতগুলি বিষয় এই রূপ আছে যে, তাহা সবিশেষ উপযোগী হইলেও তাহার প্রকৃত রূপ মীমাংসা করা নিতান্ত সুকঠিন হইয়া উঠে। যাহাই হউক বৈদিক কাল নিরূপণ করা এই প্রস্তাবের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। বৈদিক কাল বলিলে এস্থলে বর্ত্তমান কাল হইতে বৈদিক কালের কেবল অন্তরটি বুঝাইবে না কিন্তু বৈদিক সময়ে মনুষ্য দিগের বুদ্ধিবৃত্তি নীতিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কিরূপ ছিল এবং অন্য সময়েই বা ঐ সমস্ত কি প্রকার হইয়াছে, এই উভয়ের অন্তর অবধারণ করাকেও বুঝিতে হইবে।

যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত সম্যক্ অবগত আছেন, তাঁহারা ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগের সহিত অন্যান্য জাতির এক-কাল-গত সাদৃশ্য কিছুই দেখিতে পাইবেন না। যে সমস্ত আর্য্যেরা সমগ্র ইউরোপকে সুসভ্য করিয়াছেন, যদিও ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ জাতি সেই আর্য্যদিগেরই বংশোদ্ভব, তথাচ বহুকাল অতীত হইল উহাঁরা পরস্পর পৃথক হইয়াছেন। সুতরাং বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ দিগের যে সময়ে যে রূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, সেই সময়ে অন্যান্য জাতির কি রূপ অবস্থা ছিল, তাহা নিরূপণ করা নিতান্ত সহজ নহে। আর্য্যবংশীয়েরা ভুখারা প্রভৃতি স্থান হইতে হিমালয় পার হইয়া কাশ্মীর পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে বাস করেন। উহাঁরা যে কি নিমিত্ত ঐ সমস্ত স্থানে আসিয়া বাস করেন, কোন পুরাবৃত্তবিদই তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। যখন কোন প্রামাণিক পুরাবৃত্ত প্রস্তুত হয় নাই, যখন সেলট্, জরমন, শ্লাভোনীয়, রোমক, গ্রিশীয়েরা ইউরোপে পাদ নিক্ষেপ করে নাই, তৎকালে এই বিশাল উপনিবেশ পঞ্জাবাদি প্রদেশ অধিকার করিয়াছিল। যদিও এই উপনিবেশের কারণ নির্দ্দেশ করা সুকঠিন, তথাচ আমারদিগের বোধ হইতেছে যে, যে কারণে সেল্‌ট জাতি আটলান্টিক সমুদ্র পার হইয়া আমেরিকায় গিয়াছিল, ইহাও সেই রূপ হইবে। যখন স্বদেশীয়েরা স্থানান্তরে গমন করে বা ভিন্ন দেশীয়েরা স্বদেশকে আক্রমণ করে, তদ্বিষয়ে উপেক্ষা করা—হয় প্রগাঢ় ইচ্ছা, না হয় যার পর নাই আলস্য—এই উভয়ের মধ্যে অন্যতর একটিকে প্রধান কারণ বলিয়া উপলব্ধি করিতেই হইবে। ফলত যখন এক দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করিবার সময় উপস্থিত হয়, তখন আর কেহই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু যাঁহারা আমাদিগের ভাষা ব্যবহার করেন এবং আমাদিগেরই দেবগণের আরাধনা করেন, যে স্থানে গমন করিলে সেই সমস্ত লোকের সহিত আর পুনরায় সাক্ষাৎকার লাভের সম্ভাবনা নাই, সেই স্থানে যাওয়া কি রূপ লোকের কার্য্য? যাঁহাদিগের আত্ম নির্ভরের ভাব অতিশয়

প্রগাঢ়, তাঁহারা ব্যতিরেকে বোধ হয় এই রূপ স্বতন্ত্রতা অবলম্বন আর কাহারই সাধ্যায়ত্ত নহে। ভারতবর্ষের আর্য্য ব্রাহ্মণ ও পারসীকেরাই ইহার এক নিদর্শন স্থল।

আর্য্যজাতি গিরিবর হিমালয়কে উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখী হইয়া সর্ব্বাগ্রে পঞ্জাবের শতদ্রু চন্দ্রভাগা বিপাসা ইরাবতী বিতস্তা সরস্বতী ও সিন্ধু এই সাত নদীর উপকূলে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তদবধি এই সুবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষ তাঁহাদিগেরই বাস-ভূমি বলিয়া প্রথিত আছে। ভারতবর্ষে বাস করিবার পূর্ব্বে ইহাঁরা গ্রীশীয় ইটালীয় স্লাভোনীয় জর্ম্মন ও সেলট জাতিদিগের পূর্ব্ব পুরুষের সহিত একত্রে হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরে বাস করিতেন। ভাষা অনুসন্ধান করিয়া যে প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়,তাহা অভ্রান্ত ও অখণ্ডনীয়; বিশেষত যখন পুরাবৃত্তের সৃষ্টি হয় নাই, তখন ভাষাতত্ত্বের প্রমাণে সবিশেষ সমাদর করা কর্ত্তব্য হইতেছে। ভারতবর্ষীয় দিগের সহিত ইউরোপীয় দিগের কোন সম্পর্ক আছে কি না ইহা অন্য কোন রূপ প্রমাণ দ্বারা নির্ণয় করা নিতান্ত অসম্ভব কিন্তু এই দুই জাতির ভাষাগত সামঞ্জস্য নিরীক্ষণ করিলে তদ্বিষয়ে এক প্রকার নিঃসংশয় হওয়া যায়। যখন গ্রীশ দেশে গ্রীশীয়েরা এবং ভারতবর্ষে ভারতবর্ষীয়েরা অধিবাস করেন নাই, তখন এই উভয় জাতির পরস্পর সম্পর্ক বিষয়ে ভাষা ভিন্ন অন্য কোন রূপ প্রমাণের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। গ্রীশীয়েরা এবং ভারতবর্ষীয় রাজা পুরু এক পূর্ব্বপুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং এই উভয় দেশীয়েরা এক দেবদেবীরই উপাসনা করিত। আর ভারতবর্ষীয়দিগের শিরায় যে শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, ইংরাজদিগের শিরা সমূহে তাহাই সঞ্চার করিতেছে। ইংরাজ ও গ্রীশীয়দিগকে এই দুইটি হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইলে ভাষা ভিন্ন আর কি রূপ প্রমাণ সবিশেষ আদরণীয় হইবে? বলিতে কি এক্ষণে এমন কেহ বিচক্ষণ নাই, যিনি ভাষাতত্ত্বের প্রমাণ সুস্পষ্ট পরীক্ষা করিয়া হিন্দু, গ্রীশীয় ও টিউটনদিগের এক বংশোদ্ভব বলিয়া যে বিলক্ষণ একটি সম্বন্ধ আছে, তাহার উচ্ছেদ সাধনে কৃতকার্য্য হইবেন। আজিও ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে ভাষাগত এই রূপ সাদৃশ্য আছে যে তাহাই আর্য্যেরা যে এক সময়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন তাহার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যদি ইহা তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা কর, তথাচ এই অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে পারিবে না। ঈশ্বর, গৃহ, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, হৃদয়, অশ্রু, বাসি ও বৃক্ষ প্রভৃতি কতক গুলি শব্দ ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে এক রূপ ভাষার রীতিতে ব্যবহার হইয়া থাকে। সুতরাং এক্ষণে স্পষ্টাক্ষরে ইহাই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, যে এক জন অপরিজ্ঞাত ব্যক্তিকে আহ্বান করিলে যদি তিনি গ্রীক জর্ম্মন বা ভারতবর্ষীয় ভাষায় উত্তর প্রদান করেন, আমরা অবশ্যই তাঁহাকে আমাদিগেরই এক জন মনে করিব। যদি এই বিষয়ে ইতিবৃত্ত বেত্তারা অনুমোদন না করেন, যদিও কবিগণ ইহাকে অপসিদ্ধান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, যদিও প্রাণিবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা ইহা সংশয়াত্মক বলিয়া স্বীকার না করেন, তথাচ ভাষাতত্ত্ব যে রূপ বলিতেছে, তাহাতে সকলকেই মস্তক অবনত করিতে হইবে। অতি পূর্ব্বকালে এমন একটি সময় ছিল, যে সময়ে সেলট্ জরমন্ স্লাভোনীয় গ্রীশীয় ইটালীয় পারসীক এবং হিন্দুদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা এক স্থানে একত্রে বাস করিতেন। কেহ কেহ কহেন যে সেমিটিক ও টিউরেনিয় জাতী-

য়েরা উহাঁদিগের সহিত বাস করিত কিন্তু তাহার কোন বিশেষ প্রমাণই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

অন্যান্য সহবাসীরা পশ্চিম দিকে গমন করিলে হিন্দুজাতি পরিশেষে দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে আসিয়াছিলেন। ইহাঁরা যে সর্ব্বশেষে আসিয়াছিলেন, তাহার এক প্রকার প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যায়। জরমন ও গ্রীক ভাষার সহিত ইহাঁদিগের ভাষার বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে, জরমন ও গ্রীক ভাষায় ইহাঁদের ব্যাকরণ ও ভাষার রীতির অনেকাংশ গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু জর্মন ও গ্রীক ভাষা অন্যান্য ভাষা হইতে এক প্রকার স্বতন্ত্র; অন্যান্য ভাষার সহিত ইহার তাদৃশ সৌসাদৃশ্য নাই। ইহা দ্বারাই এক প্রকার নির্ণীত হইতেছে যে সহবাসী আর্য্যেরা স্থানান্তরিত হইলে কিয়ৎকাল বিলম্বে ইহাঁরা হিন্দুস্থানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

থিওডোর পার্কর।

২৭২ সংখ্যক পত্রিকার ২৫৮ পৃষ্ঠার পর।

ধর্ম্মভাব, নির্ভরের ভাব ও অনন্ত ভাবের অস্তিত্বই ইহার বিষয়ীভূত ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। আমাদিগের এই সমস্ত ভাব ও ইহার বিষয়ীভূত ঈশ্বর এই উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধে বিশ্বাস মানবপ্রকৃতি হইতে অপ্রতিহতভাবে উৎপন্ন হয়। মনুষ্যের যত গুলি অভাব আছে, সেই অভাব পূর্ণ হইবার তত গুলি বিষয়ও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। আমাদের যেমন দর্শনেন্দ্রিয় আছে এবং তাহার বিষয় বাহ্য পদার্থ ও দর্শন-ক্রিয়া-সম্পাদক আলোকও রহিয়াছে; যেমন প্রীতি ও স্নেহ আছে এবং পুত্র কলত্র প্রভৃতি উহার বিষয়ও দেদীপ্যমান রহিয়াছে; সেই রূপ আমাদিগের অন্তরে যে ধর্ম্মভাব নিহিত আছে, তাহা চরিতার্থ হইবার বিষয় অবশ্যই বিদ্যমান রহিয়াছে। যখন এই ধর্ম্ম ভাবকে নির্ভরের ভাব বলিয়া স্বীকার করা যাইতেছে, তখন যাঁহাতে এই নির্ভরটি অর্পিত হয়, এমন এক স্বতন্ত্র আমাদিগের অনায়ত্ত বিষয় ইহা দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এইটি যতদূর সত্য, ইহা অপেক্ষা স্থিরতর সত্য আর কিছুই নাই।

যখন বাহ্য কারণ উপস্থিত হয়, তখন বাহ্য ইন্দ্রিয়ের ন্যায় আধ্যাত্মিক বৃত্তি সমুদায় সমবেত হইয়া কার্য্য করে। সহজ জ্ঞান আমারদিগের পূর্ব্বচিন্তা ও ইচ্ছার বশীভূত নহে; সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমরা যাঁহার উপর নির্ভর করি, এমন একটি পুরুষের ভাব আনয়ন করিয়া দেয়। আমরা সেই পুরুষকেই ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করি। এক্ষণে ইহা সুস্পষ্টই নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে ধর্ম্মভাব—নির্ভরের ভাব ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্পষ্ট রূপে প্রকাশ করিয়া থাকে এবং সহজ জ্ঞান সেই অস্তিত্ব পরিস্ফুট রূপে প্রতিপন্ন করে।

মনুষ্যের এই ভাবটি সর্ব্বাগ্রেই উপস্থিত হইয়া থাকে। আমাদিগের অন্তরে যে অন্যান্য ভাবের আবির্ভাব হয়, ইহাই তৎসমুদায়ের মূল। যদি আমাদিগের জ্ঞানের উপাদান স্বরূপ এই ভাবটি না থাকিত, তাহা হইলে আর কোন ভাবই আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগের শরীরের বাহ্য আলোকাদি পদার্থ প্রকাশ করিয়া দেয়। সেই আলোকাদি পদার্থ শরীরের আয়ত্ত নহে কিন্তু শরীরই উহাদের অধীন। যদিও ইন্দ্রিয়গণ তৎসমুদায় প্রকাশ করিয়া দিতেছে কিন্তু তাহারা যে কি, তাহা ইন্দ্রিয়ের গম্য নহে।

সেই রূপ জ্ঞান কেবল আত্মাকে নহে কিন্তু আত্মার আশ্রয় স্থান পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া দিতেছে। কিন্তু সেই আশ্রয়টি যে কি পদার্থ, তাহা জ্ঞানের আয়ত্ত নহে। বাহ্য কার্য্য আমাদিগকে এই রূপ একটি কারণ উপস্থাপিত করিয়া দেয়, যদ্দ্বারা আমরা ঈশ্বরের ভাব লাভ করিতে পারি কিন্তু বাহ্য কার্য্য স্বয়ং ঐ ভাব উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না। ইহা মনুষ্যের প্রকৃতি দ্বারাই আনীত হইয়া থাকে। এই কারণে কেহ কেহ ইহাকে অন্তর্নিহিত ভাব বলিয়া ব্যক্ত করেন এবং কেহ কেহ বা কহিয়া থাকেন যে আত্মা দেহের আশ্রয় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে জীবনের উন্নত অবস্থাতে যাহা অবগত হইবে, ইহা তাহারই স্মারক। যাহাই হউক মানবপ্রকৃতি যে ঈশ্বরের ভাব উপলব্ধি করিতেছে, এই উত্তর অভিপ্রায়ই সেই সত্যের অন্যরূপ বর্ণনা মাত্র। ফলত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস যে মনুষ্যের প্রকৃতিসিদ্ধ, তাহাতে আর কোন সংশয়ই নাই। দর্শন ক্রিয়া দ্বারা যেমন আলোকের অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে, আমরা বিদ্যমান রহিয়াছি বলিয়াই যেমন আমাদিগের অস্তিত্বে ভ্রান্তি উপস্থিত হইতেছে না, সেইরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস ধর্ম্মভাব ও আত্ম প্রত্যয় দ্বারা অপ্রতিহত ভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঈশ্বরের এই অস্তিত্ব জ্ঞান পদার্থবিদ্যানুসারে সহজ জ্ঞান এবং পূর্ব্বতন ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে ঐশিক প্রত্যাদেশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এক্ষণে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ভৌতিক জগতের কার্য্য কারণের শৃঙ্খলা, সার্থকতা ও সৌন্দর্য্য দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে বিশ্বাস উৎপন্ন হইতেছে না এবং আধ্যাত্মিক জগৎ ও অনন্ত ভাবও উহা উৎপন্ন করিতেছে না। এই বিশ্বাস উৎপন্ন হইবার নিমিত্ত কোন তর্কেরই আবশ্যকতা নাই, ইহা একমাত্র জ্ঞানেরই আয়ত্ত। আপনার অস্তিত্ব জ্ঞান যেমন স্বভাবত শীঘ্র উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই রূপ এই বিশ্বাসটি মনুষ্যের সহসা আপনা হইতে উপস্থিত হয়। যখন আমরা স্বাধীন নহি, যখন কোন এক অলৌকিক শক্তির উপর আমাদিগকে নির্ভর করিতে হয়, তখন এই বিশ্বাস কদাচই আমাদিগের অপনীত হইবার নহে।

যদিও ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জগতের রচনা চাতুরী ও মাধুরী ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক এই বিশ্বাস উৎপাদন করিতেছে না কিন্তু ভৌতিক জগৎ এই বিশ্বাস সংস্থাপন ও আধ্যাত্মিক জগৎ উহা সমধিক সমর্থন করিতেছে। আমরা মনোবিজ্ঞান ও পদার্থ বিদ্যা অনুশীলন করিবার পূর্ব্বে কদাচই ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞান-শূন্য থাকি না, সুতরাং চিন্তাশক্তি উদ্রিক্ত করিয়া যে এই জ্ঞানটি উপার্জ্জন করিতে হয়, ইহা নিতান্ত অবিশ্বাস্য ও অশ্রদ্ধেয়। ঈশ্বরের এই অস্তিত্ব জ্ঞান এই রূপ একটি নিয়ম দ্বারা আপনা হইতে উপস্থিত হইয়া থাকে, যাহার গতি সর্ব্বাগ্রে আমরা কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হই না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞান সপ্রমাণ হইবার পূর্ব্বে তদ্বিষয়ক একটি বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। আত্মপ্রত্যয় ঐ বিশ্বাসকে সমর্থন করিবার নিমিত্ত বুদ্ধিবৃত্তির সম্মুখে উপস্থাপিত করে। আত্মপ্রত্যয় ব্যতিরেকে ঈশ্বরজ্ঞান লাভ হওয়া কোন রূপেই সম্ভব হয় না। বুদ্ধিবৃত্তি হইতে যত কেন তর্ক বিতর্ক উত্থিত হউক না, ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞান কখনই উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইবে না; কিন্তু সহজ জ্ঞান সাহায্যে ইহা আনীত হইলে তৎসমুদায় দ্বারা সম-

র্থিত হইয়া থাকে। যদি তর্কের মূল সত্যটি স্বীকার করা না যায়, তাহা হইলে সমুদায় তর্কই নিরর্থক হইয়া থাকে। যদি শিষ্যের হৃদয়ে ঈশ্বরের ভাব না থাকে, তাহা হইলে উপদেষ্টার তর্কশক্তি কদাচই উহা উৎপাদন করিতে পারে না। জন্মান্ধ ও বধিরের দৃশ্য বস্তু ও শব্দের স্বরূপ জ্ঞান নাই, সুতরাং তাহাদিগের নিকট দৃশ্য বস্তু ও শব্দের অস্তিত্বের বিষয় উল্লেখ করিলে তাহাদিগকে উহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করান নিতান্ত সুকঠিন হইয়া উঠে। সেই রূপ যদি শিষ্যের সহজ জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে উপদেষ্টা আপনার তর্কশক্তির প্রাখর্য্য তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির গোচর করিতে পারেন কিন্তু ঈশ্বরের ভাব কদাচই সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হন না। সহজ-জ্ঞান-মূলক অনুভব না থাকিলে মনোবিজ্ঞান-সঙ্গত তর্ক কেবল ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তির পরিচয় প্রদান করিতে পারে। অনুসন্ধান-পর তর্ক সংকীর্ণ ও অসম্পূর্ণ কার্য্যের নিমিত্ত একটি সংকীর্ণ ও অসম্পূর্ণ কারণ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়; কিন্তু পূর্ণ সনাতন ব্রহ্মকে কখনই অভিব্যক্ত করিতে সমর্থ হয় না।

ঈশ্বরজ্ঞান সমস্ত বাহ্য কারণকে অতিক্রম করিয়া সহজ জ্ঞান দ্বারা উৎপন্ন হইতেছে। এই জ্ঞান উৎপন্ন হইবার কালে কোন প্রতিবন্ধকই উপস্থিত হয় না এবং ইহা পূর্ণ অখণ্ড ভাবে উত্থিত হইয়া থাকে। যখন আত্মা প্রকৃত অবস্থায় অবস্থিত থাকে, যখন উহার স্বাধীন গতি প্রতিরুদ্ধ না হয়, তখনই আমরা অনন্তশক্তি অনন্তজ্ঞান পূর্ণমঙ্গল ঈশ্বরের ভাব লাভ করিয়া থাকি। কিন্তু যখন আত্মার প্রকৃত অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা না হয়, তখন মনুষ্য ঈশ্বরের সঙ্কীর্ণ ও অসম্পূর্ণ ভাব উপলব্ধি করিয়া থাকে। তৎকালে অন্তর হইতে অবিনশ্বর ঈশ্বরের আদিম ভাবটি তিরোহিত হইয়া যায়। তখন মনুষ্য মুখে যেরূপ ঈশ্বরের ভাব অভিব্যক্ত করে, তাহা একান্ত অসম্পূর্ণ, নিতান্ত অসম্ভব এবং যারপর নাই বিষবাদী। মনুষ্যোচিত কার্য্য, মনুষ্যোচিত চিন্তা, মনুষ্যোচিত বোধ ও মনুষ্যোচিত রিপু এবং বিনশ্বর মনুষ্যের সমস্ত পরিমিত ভাব ঐশিক ভাবে আরোপিত হয়। ইহার প্রকৃত বিশুদ্ধতা ও সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়া যায়। যাহারা ইহার বিষবাদিতা প্রদর্শন করিয়া তদ্বিষয়ে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া নির্দেশ করা হয়। পূর্ব্বতন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী এবং অন্যান্য সুবিখ্যাত ধর্ম্মপরায়ণ তত্ত্ববিৎ ঈশ্বরের এই পরিমিত ভাবে বিশ্বাস করেন নাই বলিয়া নাস্তিক নামে প্রথিত হইয়াছেন।

এক্ষণে আমরা যেরূপ ঈশ্বরের ভাব নির্দ্দেশ করিলাম, তাহা এক প্রকার অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। অপূর্ণ জীব পূর্ণ ঈশ্বরের প্রকৃত ভাব কদাচই গ্রহণ করিতে পারে না। মনুষ্যের মনের প্রত্যেক ভাব দেশ কাল ও বাহ্য কারণে আবদ্ধ আছে কিন্তু অনন্ত ঈশ্বর এই সকল সীমাই অতিক্রম করিয়া আছেন। মনুষ্য অপূর্ণ ভাব ব্যতীত কখনই পূর্ণ-ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে যেমন এক রেণু বালুকা, সেই রূপ সেই অনন্ত পূর্ণ পুরুষের পক্ষে অপূর্ণতা। পূর্ণতা ও অপূর্ণতা এই উভয়ের যে কত অন্তর তাহা অনুভব করা যায় না। মনুষ্যের ভাব ঈশ্বরকে আপনার আকারে পরিণত করিয়া ফেলে। কিন্তু যে ভাব অনিয়ত এবং যাহা প্রকৃত বিশ্বাস উৎপাদন না করিয়া নিয়ত সংশয় উদ্রিক্ত

করিয়া দেয়, তদ্বিষয়ে নির্ভর না করিয়া আমাদিগের প্রকৃতিতে ঈশ্বরের যে আদিম ভাব উপলব্ধ হয়—তিনি জ্ঞান শক্তি প্রভৃতি সমুদায় বিষয়ে অনন্ত—এই যে অভ্রান্ত ভাব আবির্ভূত হয়, আমাদিগের তাহাই অঙ্গীকার করা কর্ত্তব্য। এই ভাব সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত। এই ভাব ঈশ্বরের স্বরূপকে সংকীর্ণ করিতেছে না এবং ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অনেকানেক ধর্ম্ম-পরায়ণ মহাত্মা ঈশ্বরের এই প্রকৃত ভাব অবগত হইয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন; ইহা বুদ্ধিবৃত্তি ও বিশ্বাস এই উভয়েরই প্রীতিকর বলিয়া অবগত হন এবং কেহ গাঢ়তর অনুসন্ধান দ্বারা ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ জানিতে পারেন না, হৃদয়ের সহিত এই পূর্ব্বতন বাক্যে অনুমোন করেন। কেহ কেহ বা আপনার সংকীর্ণতা ঈশ্বরের স্বরূপে আরোপ করিয়া তাঁহাকে আপনার ন্যায় প্রস্তুত করে। ধর্ম্মশাস্ত্র যে রূপে ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছে, ইহা দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম উপস্থিত হয়। যাঁহারা ঈশ্বরের এই প্রকার অপ্রাকৃত অসঙ্গত স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে যান, তাঁহারা আপনার কল্পনার একটি ছায়া প্রস্তুত করিয়া সেই ছায়াকে ঈশ্বর বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকেন। মনুষ্যের প্রকৃতিতে ঈশ্বরের যে ভাবটি নিবদ্ধ রহিয়াছে, যাহা ঈশ্বরের প্রকৃত ও সঙ্গত স্বরূপ অভিব্যক্ত করিতেছে, তাহা চিরস্থায়ী ও সকল আত্মাতেই সমভাবে অবস্থান করিতেছে। ঈশ্বর-জ্ঞান যদিও আমাদিগের অন্তরে নিহিত আছে, তাহা কদাচই অপনীত হইবার নহে, সকলেই তাহা অধিকার করিতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের অখণ্ড অবিকৃত জ্ঞানলাভ ও বাক্যে তাহা অভিব্যক্ত করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে এবং স্বরূপত উহা অসম্ভব। সেই সর্ব্বব্যাপী যে কি, তাহা তিনিই বিলক্ষণ অবগত আছেন।

পৌত্তলিকতা।

যাহা কিছু ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়, পৌত্তলিকতা তন্মধ্যে একটি প্রধান। সত্যের সহিত মিথ্যার যে প্রভেদ, ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত পৌত্তলিকতার সেই প্রভেদ। ঈশ্বর মনুষ্যের আত্মাতে যে সনাতন ধর্ম্মের ভাব সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, তাহাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আদর্শ; আর ঈশ্বরকে পদ-চ্যুত করিয়া তাঁহার আসন অন্যকে সমর্পণ করাই পৌত্তলিকতা। দোষ-গুণ-বিশিষ্ট পরিমিত ক্ষুদ্র বস্তুকে ধর্ম্মের আদর্শ করা হইতেই পৌত্তলিকতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অন্যবিধ পদার্থ। সংসারে ইহার আদর্শ নাই—যাঁহার জ্ঞান সমুদায় বেদ্য বস্তুকে জানিতেছে, যাঁহার প্রীতি সমুদয় সংসারকে আনন্দ-রসে সিক্ত করিয়া রাখিয়াছে, এবং যাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছা অনবরত কল্যাণ-পরম্পরা প্রসব করিতেছে; তিনিই পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের এক মাত্র আদর্শ। কি মর্ত্ত্য লোকে, কি দিব্য লোকে, যেখানে যত উন্নত আত্মা থাকুন, সকলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের নিম্নে অবস্থান করিতেছেন। এমন উন্নত ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে কেহ অধস্তন মর্ত্ত্য আদর্শের অধীন করিবার চেষ্টা করিতে গেলে আমারদের মনে দুঃসহ মনস্তাপ আসিয়া উপস্থিত হয়! ঘোর পৌত্তলিক ভিন্ন আর কেহই কোন মৃত বা জীবন্ত মনুষ্যকে ধর্ম্মের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না।

এক দিকে বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক পৌত্তলিকতা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পথে বিঘ্ন দিতেছে, আর দিকে বাইবলিক পৌত্তলি-

কতা নানাবিধ বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছে। এ দেশীয় পৌত্তলিকতা এক প্রকার নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে এবং ইউরোপের ভাব দেখিয়াও বোধ হইতেছে যে, তথাকার বাইবলিক পৌত্তলিকতাও মুমূর্ষু দশায় উপনীত হইতেছে। এক্ষণে সেখানকার বুদ্ধিমান্ লোকেরা আর বাইবলিক পৌত্তলিকতাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। ইহা অতি আহ্লাদের বিষয় যে হিন্দুসমাজে পৌত্তলিকতার যে রূপ অবস্থা, ইউরোপেও বাইবলিক পৌত্তলিকতার অবিকল সেই রূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। এ দেশের শিক্ষিত দলের ন্যায় তথাকার অনেকেই কেবল ভীরুতা বশত আপনারদিগকে কৃত্রিম দেবতা য়ীশু খৃষ্টের উপাসক বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছেন। ইহা পৌত্তলিকতার দুরবস্থা-বিষয়ে সামান্য নিদর্শন নহে। রোমান ক্যাথলিকেরাই খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রকৃত দৃষ্টান্ত। য়িশুখৃষ্ট যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া যান, রোমান্ ক্যাথলিকদিগের মধ্যেই তাহা অবিতথ রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। বিবাহ না করিয়া চিরজীবন সন্ন্যাসী হইয়া অবস্থান করা প্রভৃতি ক্রাইষ্টের আচরণ-সকল রোমান্ ক্যাথলিক পুরোহিতেরাই অনুকরণ করিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ইউরোপের অধিকাংশ স্থানেই এই মত প্রতিপালিত হইতেছে। প্রটেষ্ট্যাণ্ট, কোয়েকর, বা ইউনিটেরিয়ানেরা যে পরিমাণে খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে সংশোধন করিয়া লইয়াছেন; সেই পরিমাণে প্রকৃত খৃষ্টীয় ধর্ম্ম হইতে তাঁহারা দূরবর্ত্তী হইয়াছেন। প্রথমে রোমান্ ক্যাথলিক-দিগের মধ্যে বাইবলিক পৌত্তলিকতার যে রূপ প্রবলতা ছিল, প্রটেষ্টাণ্টেরা তাহার কিয়দংশ রহিত করিয়া দিয়াছেন; আবার প্রটেষ্টাণ্টদিগের মধ্যে যে সকল পৌত্তলিকতা আছে, ইউনিটেরিয়ানেরা তাহার কিয়দংশ বাদ দিয়া চলেন। ইউনিটেরিয়ানদিগের মধ্যে যে সকল পৌত্তলিকতা আছে, তাহার দ্বারাই ইউনিটেরিয়ানেরা অদ্যাপি খৃষ্টীয়ান্ বলিয়া পরিচিত হইতেছেন; সে টুকু সংশোধন করিতে গেলে ইউনিটেরিয়ান্ ধর্ম্মের আর খৃষ্টীয়ত্ব কিছুই থাকে না। বাস্তবিক আমরা যাহা বলিতেছি, ইউরোপে তাহাই ঘটিতেছে। এক্ষণে ইউরোপে অনেকেই ক্রাইষ্টের নাম গন্ধ উঠাইয়া দিয়া আত্ম-গত উদার ধর্ম্ম-ভাব অনুসারে সত্যের আশ্রয় লইয়াছেন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহাদিগের নিকট মধুময় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে সম্প্রতি এখানকার কেহ কেহ ক্রাইষ্টের প্রতি নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন। ক্রাইষ্টের যে রূপ চরিত্র প্রসিদ্ধ আছে, বোধ হয় সেই রূপ চরিত্র ইহাঁরা ভাল বাসেন বলিয়া ক্রাইষ্টের প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াছেন। বাইবলে ক্রাইষ্টের চরিত্র যে রূপ বর্ণিত আছে, তাহার অধিকাংশই অসম্ভব ও মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে; অবশিষ্ট ভাগ কত দূর নির্দ্দোষ, তাহার বিচার করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। যদিও সেই গুলিকে উৎকৃষ্ট বলিয়া গ্রহণ করা যায়; তথাপি মহম্মদ, নানক ও চৈতন্য অপেক্ষা ক্রাইষ্টকে অধিক সম্মান করিতে গেলেই পক্ষপাত হইয়া উঠে। সামান্য লোকদিগের মধ্যে যতগুলি ধর্ম্ম-সংস্কারকের উদয় হইয়াছিল, তন্মধ্যে এই চারি জন অধিক প্রসিদ্ধ, ইহা স্বীকার করি। তথাপি এখানকার প্রসিদ্ধ প্রচারক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ যে শ্রেণীর লোক, ইহাঁরদিগকে সে শ্রেণীতেও গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ইহাঁরদের হৃদয়ে ঈশ্ব-

রেতে প্রগাঢ় ভক্তি-ভাব ছিল বটে; কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধিতে ইঁহারা অতি সামান্য লোক ছিলেন। রামমোহন রায় আবার আর এক শ্রেণীর লোক; যে শ্রেণীর উচ্চ পদবীতে পূর্ব্বকালের সাক্রেটিস, প্লেটো; কঠ, তলবকার ও শঙ্করাচার্য্য ছিলেন এবং এক্ষণকার নিউমেন, পার্কর, মহাত্মা কূজন ও ব্রহ্মবাদিনী কবকেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। রামমোহন রায় যেমন উপনিষদের মহা বাক্যে শ্রদ্ধা করিতেন, তেমনি ক্রাইষ্টেরও উপদেশ ভাল বাসিতেন; কিন্তু বাইবল-সম্মত তাহার অলৌকিক ঐশী শক্তি অঙ্গীকার করিতেন না, তাহার সকল চরিত্রকেও বিশুদ্ধ বলিতেন না, এবং তাহাকে পুণ্য-পাপ-বিশিষ্ট মনুষ্য বলিয়াই জানিতেন—নিষ্পাপ বলিয়া জানিতেন না। তিনি সর্ব্ব প্রকার পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে শুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ কেবল একমাত্র পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য কলিকাতাতে এই ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। তাঁহার সংস্থাপিত ব্রাহ্মসমাজ-গৃহের অধিকার-পত্রে লিখিত আছে যে "কেবল এই বিশ্বের স্রষ্টা, পাতা ও নিত্য, অচিন্ত্য, ধ্রুব, পরমেশ্বরের পূজা ও উপাসনার জন্য এই গৃহ স্থাপিত হইল—নাম-রূপ-উপাধি-বিশিষ্ট কোন জীবের উপাসনার জন্য নহে, যাহাকে কোন লোক বা কোন সম্প্রদায় উপাসনা করে" *। তলবকার মহর্ষির এই ভাবের বচনও ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে। "যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে"। "যিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান—লোকেরা যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখনো ব্রহ্ম নহে"। কিন্তু আশ্চর্য্য যে ইউরোপ প্রদেশের এত বড় দর্শনকার বিখ্যাত কূজন, কেবল রোমান ক্যাথলিক দেশে জন্ম হওয়া প্রযুক্ত, ক্রাইষ্টকে একেবারে ঈশ্বরের পুত্র ও অবতার বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনি তাঁহার দর্শন-শাস্ত্রে ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের এই উদাহরণ দিয়াছেন যে, ঈশ্বর এমত করুণাময় যে তিনি আপনার সবে একটি মাত্র পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে বলিদানের জন্য দিয়াও মনুষ্যের হিত-সাধন করিয়াছেন। মহা পণ্ডিত কূজনের মুখ হইতে এমত অমূলক ও অসম্ভব কথা কি তীব্র-রূপে আমারদের কর্ণে প্রবিষ্ট হয়! হায়! বাল্য-সংস্কারের কি আশ্চর্য্য বল! পৌত্তলিকতার কি দুর্জ্জয় মোহ!

* For the worship and adoration of the eternal unsearchable and immutable Being who is the Author and Preserver of the universe but not under or by any other name designation or tittle peculiarly used for and applied to any particular being or beings by any man or set of men whatsoever.—Trust deed.

RESURRECION OF JESUS.

"The Cross was the banner under which madmen assemble to glut the earth with blood."

THE history of the life of an ordinary man terminates commonly with his death; but it is different with a Man-God who has the power of raising himself from the dead, or whom his adherents have the faculty of making rise at will. This happened to Jesus: thanks to his apostles or evangelists, we see him still playing a considerable part even after his decease.

The moment Christ was arrested, his disciples, as we have narrated, dispersed themselves in Jerusalem and the neighbourhood, with the exception of Simon Peter, who did not lose sight of him during his examination at the house of the high priest. This apostle was anxious, for his own interest, to know the result of it. Encouraging themselves on finding that Jesus had not criminated them in his examinations, the disciples re-assembled, concerted measures, and determined, as their master was dead, or reputed so, to take advantage of the notions which he had diffused during his mission. Accustomed for so long a period to lead a wandering life under his command, and subsist at the expense of the public by means of preaching, exorcisms, and miracles, they resolved to continue a profession more easily exercised, and incomparably more lucrative than their original occupations. They had enjoyed an opportunity of observing that it

was better to catch men than fish. But how could the disciples of a man who was punished as an impostor, make themselves listened to? It was necessary to give out that their master having, during his life, raised others from the dead, had, after his own death, raised himself, in virtue of his omnipotence. Jesus had predicted it; it was therefore necessary to accomplish the prediction. The honour of the master and his disciples thereby acquired a new lustre; and the sect, far from seeing itself annihilated or disgraced, was enabled to acquire new partizans in this credulous nation.

In consequence of this reasoning, the good apostles had only to make the body of their master, dead or alive, to disappear, which, if it had remained in the tomb, would have borne evidence against them. They did not even wait till the three days and three nights in the pretended prophecy were expired. The dead body disappeared on the second day; and thus the second day after his decease, our hero, triumphing over hell and the grave, found himself revivified.*

If Christ was not yet dead of his punishment, his resurrection had nothing surprising in it. If he was actually dead, the cave, where his body was deposited, might very probably have secret passages, through which they could enter and come out, without being observed or stopt by the enormous stone with which, they had affected to block up its entrance, and near which the guards had been placed. Thus the dead body might have been carried off either by force or by stratagem. and perhaps it had never been deposited in the tomb at all. In whatever manner the affair was transacted, a report was circulated that Jesus was risen, and his body not to be found.

Nothing is of more importance to a Christian, than to ascertain satisfactorily the resurrection of Christ. St. Paul tells us, that "if Jesus be not risen, our hope is vain." Indeed without this miracle of Omnipotence, intended to manifest the superiority of Christ over other men, and the Interest the Diety took in his success, Jesus must appear only as an adventurer, or weak fanatic, punished for having given umbrage to the priests of his country.

It is therefore requisite to examine seriously a fact, on which alone the belief of every Christian is founded. In doing this it is necessary to satisfy ourselves of the quality of the witnesses who attest the fact, whether they were acute, disinterested, and intelligent, persons; if they agree in the narratives they give, or in the circumstances they relate. Such are the precautions usually employed to discover the degree of probability or evidence of facts. They are also the more necessary, when it is intended to examine *supernatural* facts, which, to be believed, require much stronger proofs than ordinary facts. On the unanimous testimony of some historians, we readily believe that Cæsar made himself master of Gaul; the circumstances of his conquest would be less established, were we to find them related by himself only, or his adherents; but they would appear incredible, if we found in them prodigies or facts contrary to the order of nature. We would then have reason to believe, that it was intended to impose on us; or, if we judged more favourably of the authors, we would regard them as enthusiasts and fools.

Agreeably to these principles, adopted by sound criticism, let us consider who are the witnesses that attest the marvellous, and consequently the least probable facts which history can produce. They are apostles—But who are these apostles? They are adherents of Jesus. Were these apostles enlightened men? Every thing proves that they were ignorant and rude, and that an indefatigable credulity was the most prominent trait in their character. Did they behold Jesus rising from the dead?—No;—no one beheld this great miracle The apostles themselves did not see their master coming out of the grave; they merely found that his tomb was empty; but this by no means proves that he had risen. It will however be said, the apostles saw him afterwards and conversed with him, and that he likewise shewed himself to some women, who knew him very well. But these apostles and these women, did they see distinctly? Did not their prepossessed imaginations make them see what did not exist? Is it absolutely certain that their master was dead before they laid him in the tomb?

In the *second* place, were these witnesses *disinterested?* The apostles and disciples of Jesus were doubtless interested in the glory of the master they had followed during the course of his mission. Their interests were confounded with those of a man who enabled them to subsist without toil. Several among them expected to be recompensed for their attachment, to him, by the favours which he promised to bestow on them in the kingdom he was about to establish. Finding these hopes destroyed by the death, real or supposed, of their chief, most of the apostles, persuaded, that all was over, lost courage; but others, less daunted, concieved that it was not necessary *to throw the handle after the hatchet* that they might profit still by the impressions which the preaching of Christ and his wonders had made on the people. They believed that their master might again return, or, if they supposed him dead, they could feign that he had foretold he would rise again. They therefore agreed that it was proper to circulate the report of his resurrection; to say that they had seen him and to assert that Jesus had triumphantly come out of the tomb: which would appear very

* The ancient framers of the Gosples have fabricated one which they have ascribed to Nicodemus. In it we learn how Christ passed his time after his death till his resurrection, his journey to hell, the deliverance of the patriarchs, the discomfiture of Satan, &c. All these details are attested by two dead persons who came purposoly from the other world, to acquaint Annanias, Caiphas, and the doctors of Judea of these events. Codex, Apocryph. N. T. Tome 1. p. 238, &c.

credible in the case of a personage who had evinced himself capable of raising others from the dead. Knowing the imbecility of those they had to deal with, they presumed that the people were prepared long beforehand to believe the marvellous wonder which they intended to announce. They conceived, that, in order to subsist, it was necessary to continue preaching the doctrine of a man who would not have attracted an audience, if it had not been taken for granted that he was risen again. They felt that it was necessary to preach the resurrection of Christ, or consent to perish with hunger. They foresaw, moreover, that it was necessary to brave chastisement and even death, rather than renounce an opinion or doctrine on which their daily subsistence and welfare absolutely depended. Hence unbelievers conclude, that the witnesses of the resurrection of Christ were any thing but disinterested, and were spurred on by the principle, that *he who risks nothing, gains nothing*.

In the *third* place, are the witnesses of the resurrection of Christ *unanimous* in their evidence? Much more, are they consistent with themselves in the narratives they give? We find neither the one nor the other. Though Jesus, according to some of the evangelists, had foretold in the most positive manner, that he would rise again,* St. John makes no mention of this prediction, but expressly declares, that the disciples of Jesus *knew not that he must rise again from the dead*.† This denotes in them a total ignorance of that great event, said however, to have been announced by their master; and creates a suspicion that these predictions of Christ were piously invented afterwards, and inserted in process of time into the text of St. Matthew, St. Mark, and St. Luke. Yet nothing can be more positive than the manner in which St. Matthew speaks of the prediction; he supposes it so well known by the public, that he affirms, the priests and Pharisees went to Pilate, and told him, *We remember this deceiver said while he was yet alive, that after three days he would rise again*‡. We do not, however, find in any of the evangelists a passage where this resurrection is foretold in so public and decided a manner. St. Matthew himself relates only the answer of Jesus to those who demanded of him a sign; it consisted, as we have elsewhere said, in referring them to " Jonas, who was three days and three nights in the belly of the whale; so," said he, " shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth."§ Now Jesus, having died on Friday, at the ninth hour or mid-day, and risen again the second day early in the morning, was not, as we have already remarked, "three days and three nights in the heart of the earth." Besides, the obscure manner in which Christ expressed himself in this pretended prediction, could not enable the priests and Pharisees to conclude that Jesus must die and rise again, or to excite their alarm, unless it is pretended, that, on this occasion, these enemies of Christ received by a particular revelation the interpretation of the mysterious prediction.

St. John tells us, that when Jesus was taken down from the cross by Joseph of Arimathea, Nicodemus, in order to embalm him, brought a mixture of aloes and myrrh, weighing about a hundred pounds and that he afterwards took the body, wrapt it in a clean linen cloth, furnished spices according to the custom practised by the Jews in their funeral ceremonies, and laid it in the tomb*. Thus was Jesus embalmed, carried away, and buried. On the other hand St. Matthew and St. Luke tell us that this sepulture and embalming were performed in presence of Mary Magdalene and Mary the mother of Jesus†, who, consequently must have known what Nicodemus had done; yet St. Mark, forgetting all this, tells us, that these same women *brought sweet spices* (aromatics) *in order to embalm his body*, and came for that purpose early in the morning of the day subsequent to the Sabbath‡. St. Luke has no better memory, and informs us, that these ladies came also to embalm a dead body, which according to St. John, had already received *a hundred pounds weight* of aromatics, and was inclosed in a sepulchre, the entrance of which was blocked up by a massy stone, which embarrassed the women as much at finding it as the incredulous are with these contradictions of our evangelists§.

These ladies, however, who dreaded the obstacle of the stone, did not dread the obstacle of the guard which St. Matthew placed at the entrance of the tomb. But if these women knew that Christ was to rise again at the end of three days, why were they so careful in embalming his body?—unless indeed we suppose that Jesus made a secret to his mother and the tender Magdalane of an event which it is asserted was publicly predicted, and which was perfectly well known not only by his disciples, but also by the priests and Pharisees, of whose extraordinary precautions we are informed by St. Matthew. According to this evangelist, these precautions were founded on the fear the priests were under, that the disciples of Jesus " should come and carry away his body, and afterwards say unto the people, that he is risen from the dead; an error, which, in their opinion, would be more dangerous than the first." Nevertheless we find some women and disciples continually roaming about the tomb, going and coming freely, and offering to embalm the same dead body twice. It must be acknowledged that all this surpasses human understanding||

It is not more easy to conceive the conduct of the guards placed near the tomb at the solicitation of the priests or that

* St. Matt. xxvi. 32. St. Mark, xvi. 28.
† St. John, xx. 9.
‡ St. Matt, xxvii, 63,
§ St. Matt. xii, 38, &c,

* St, John, xix, 39—40,
† St. Matt, xxvii, 61, St, Mark, xv, 47, St, Luke, xxii55.
‡ St, Mark, xvi. I,
§ St, Luke. xxiv, 1.
|| St. Matt, xxvii, 62—66,

of the priests themselves. According to St. Matthew, these guards, terrified at the resurrectron of Christ, ran to Jerusalem to tell the priests, "that the angel of the Lord had descended from heaven, and taken away the stone which blocked up the tomb; and that at the sight of him they had nearly expired through fear." On this the priests, not at all doubting the truth of the relation of the guards, enjoined them to say publicly that the disciples of Jesus had carried away his body during the night, and while they were asleep. They also gave the soldiers money to speak in this manner, and promised to pacify the governor, if he wished to punish them for their negligence*

As to this narrative, it is proper to observe, that the guards did not say they had seen Jesus rise from the dead; they pretended merely to have seen "the angel of the Lord, descending from heaven, and rolling away the stone which was at the entrance of the tomb." Thus this history announces *an apparition* only, and not *a resurrection*. We might explain it in a manner natural enough by supposing that during the night, while the guards were buried in sleep, the adherents of Jesus came by the light of flambeaus, with an armed force, to open the tomb and intimidate the soldiers taken unawares, who in the alarm they experienced imagined they had seen their prey taken out of their hands by a preternatural power, and that they afterwards affirmed all this in order to justify themselves.

The most singular circumstance is the conduct of the priests, who believed in earnest the relation of the guards, and consequently gave credit to a miracle strong enough to convince them of the power of Jesus. But far from being moved by the prodigy which they thus believed, they gave money to the soldiers to engage them to tell, not the incident as it occurred, but that the disciples of Jesus came by night to take away the body of their master. On the other hand, the guards, who must have been more dead than alive through terror at the spectacle they had witnessed, accepted money for publishing a falsehood: a conduct for which the angel of the Lord might very properly have punished them. Far, however, from dreading punishment, these soldiers for a sum of money consented to betray their consciences. But could the Jewish priests, however base we may suppose them, be silly enough to imagine that these men, after having witnessed so terrible a miracle, would be very faithful in preserving the secret? It must have been an insignificant miracle indeed which could make no impression either on the soldiers who had seen it, or on the priests who believed it on the relation of these soldiers. If the priests were convinced of the reality of the miracle, was it not natural that they should recognise Jesus for the Messiah, and that they should unite with him in labouring to deliver their country from the yoke of idolaters?

* St, Matt, xxviii,

On this occasion indeed, the angel of the Lord seems to have bungled the affair, by so terrifying the soldier that they fled without having time to see Jesus rising from the dead whose resurrection, however, was the object of all this pompous preparation. Very far from allowing it to be seen by any one, this awkward angel chased away the guards who ought to have been the witness of the mighty wonder.

It appears in fact, that the transaction of Jesus' resurrection was seen by nobody. His disciples did not see it: the soldiers, who guarded his tomb, did not see it; and the priests and Jews did not hold this fact to be so memorable as some persons who beheld no part of it. It was only after his resurrection that Jesus shewed himself. But to whom did he shew himself? To disciples interested in saying that he was risen again; to women, who to the same interest joined also weak minds and ardent imaginations, disposed to form phantoms and chimeras.

These remarks will enable us to judge of all the pretended appearances of Jesus after his resurrection. Besides, the evangelists are not unanimous as to these appearances. St. Matthew relates, that Jesus shewed himself to Mary Magdalene and the other Mary; while St. John makes mention of Mary Magdalene singly. St. Matthew tells us, that Jesus shewed himself to the two Marys on the road whilst returning from the sepulchre on purpose to apprise the disciples of what they had seen. St. John informs us, that Mary Magdalene, after visiting the sepulchre, went and carried the news to the disciples, and thereafter returned to this same sepulchre, where she beheld Jesus in the company of angels. St. Matthew affirms, that the two Marys embraced the feet of Jesus. St. John says, Jesus forbade Magdalene to touch him. St. Matthew informs us, that Jesus bade the two Marys tell his disciples *that he was going into Galilee.* St. John says, Jesus ordered Mary to acquaint his disciples, *that he was going to his Father;* that is, to heaven.—But it is more singular still, that, according to St. Mark, the disciples themselves were not inclined to credit the apparition of Christ to Magdalene; agreeably to St. Luke, they treated all that she told them of angels as reveries. According to St. John, Magdalene herself did not at first believe that she had seen him, whom she took for the gardener.*

There is no greater certainty in the apparition of Jesus to St. Peter and John. These two apostles went to the sepulchre, but they did not find their dear master. According to St. John, he himself saw neither Jesus nor the angels. From St. Luke it appears, that these apostles arrived after the angels were gone; and from St. John, before the angels had arrived. The witnesses are indeed very little unanimous as to these angels, who seem to have been seen only by the good ladies, whom

* St. Matt, xxviii, St, John xx, St, Luke, xxiv, 11 St, Mark xvi,

they charged to announce to the disciples the resurrection of Jesus. St. Matthew makes mention of one angel only whom St. Mark calls *a young man.* St. John affirms, that there were two.

It is said, that Jesus shewed himself again to two disciples of Emaus, called *Simon and Cleophas*; but they did not recognize him, though they had lived familiarly with him. They proceeded a long while in his company without suspecting who he was—a circumstance which, undoubtedly, evinced a very strange failure of memory. It is true, St. Luke tells us that their *eyes were as if shut.* Is it not very singular that Jesus should shew himself in order not be known again? They, however, recognized him afterwards; but immediately dreading, as it would seem, to be seen too nearly, the phantom disappeared. The two disciples went immediately and announced the news to their brethren assembled at Jerusalem, where Jesus arrived fully as soon as they.

St. Matthew, St. Mark, and St. Luke, agree in telling us that when the disciples were informed of the resurrection of Jesus, they saw him for the first and last time. But the authors of the Acts of the Apostles, St. John and St. Paul, contradict this assertion, for they speak of several other appearances, which afterwards occurred. St. Matthew and St. Mark inform us that the disciples received order to go and join Jesus in Galilee; but St. Luke and the author of the Acts (i, e, the same St. Luke) says, that the disciples were ordered not to go out of Jerusalem, With respect to this last apparition, St. Matthew places it on *mountain in Galilee* where Jesus had fixed the rendezvous for the evening of the day of his resurrection Whilst St. Luke informs us, that it was at Jerusalem, and tells us, that immediately thereafter Christ ascended into heaven, and disappeared for ever. Yet the author of the Acts of the Aposles is not of this opinion; he maintains against himself, that Jesus tarried still forty days with his disciples, in order to instruct them.

There still remain to be considered two appearances of Jesus to his apostles, the one at which Thomas was not present, and refused to believe those who assured him of their having seen their master, and the other when Thomas recognised his master, who shewed him his wounds. To render one of these apparitions more marvellous, they assure us, that Jesus was seen in the midst of his disciples, *whilst the doors were shut.* But this will not appear surprising to those who know that Christ, after his resurrection, had an *immaterial* or *incorporeal* body, which consequently could make itself a passage through the smallest orifices. His disciples took him for a *spirite* yet this *spirite* had wounds, was palpable, and took food. But perhaps all this was only chimerical, and those apparitions mere illusions of sense. Indeed, how could the apostles be assured of the reality of what they saw? A being who has the power of changing the course of nature can destroy all the rules by which we judge of certainty: and on this supposition the apostles could never be certain of having seen Christ after his resurrection.

St. John speaks of several appearances of Jesus to his disciples, of which no mention is made by the other evangelists: hence we see that his testimony destroys theirs, or that theirs destroy his. As to apparitions of Jesus which St. Paul mentions, he was not a witness of them, and knew them only by hearsay, we find him accordingly speaking of them in a manner very little exact. He says for example, that Jesus shewed himself "to the twelve," while it is evident, that. by the death of Judas, the apostolic college was reduced to eleven. We are surprised to see these inaccuracies in an inspired author; they may render suspicious what he likewise says of the apparition of Jesus to five hundred of the brethren at once.* As to himself we know that he never saw his master but in a *vision.*† and considering the testimonies on which the resurrection of Jesus is founded, perhaps we may say as much of the other apostles and disciples. They were Jews, enthusiasts, and prophets; and consequently subject to dreaming even while awake. The incredulous consider this to be the most favourable opinion they can form of witnesses who attest the resurrection of the Saviour, on which however the Christian religion is solely established.

It appears indeed most certain, from nature of the testimonies we have examined, that Providence has in a singular manner neglected to give to an event so memorable and of such great importance, the authenticity it seemed to require. Laying aside faith, which never experiences any difficulty about proofs, no man can believe facts, even the most natural, from, vouchers so faulty, proofs so weak, relations so contradictory, and testimonies so suspicious as those which the evangelists furnish us on the most incredible and marvellous occurrence that was ever related. Independent of the

* 1 Cor, xv, 6.

† St. Paul himself informs us that he was ravished up to the third heaven But why was he transported thither, and what did he learn by his journeys?—*Things unspeakable, which no man could comprehend.* What advantage are mankind to derive from all this? In the Acts of the Apostles, we find that this same Paul was guilty of a falsehood in saying before the High Priest, that he was persecuted *because he was a Pharisee and on account of the resurrection.* Here, in fact, are two untruths; *First,* Paul was not a Pharisee at the time, but a most zealous apostle of the Christian religion, and consequently a Christian. Secondly, the accusations brought against him did not refer to his opinion on the resurrection. If we know that the apostles sometimes wandered from the truth, how shall we believe them on other occasions? We indeed find this great apostle continually changing his counsels and conduct. At Jerusalem he strenuously opposed Peter because he favoured Judaism, while he himself shortly after complied with Jewish rites; and boasted that he always accommodated himself to the circumstances of the times, *and became all things to all men.* By this he set an example to the Jesuits in India, who were reproached with having united the worship of the Pegans to that of Christ.

visible interest these historians had in establishing the belief of the resurrection of their master, and which ought to put us on our guard against them, they seem to have written merely to contradict one another, and reciprocally weaken their testimonies. To adopt relations, in which we have only a tissue of inconclusiveness, contradictions, improbable facts, and absurdities, calculated to destroy all confidence in history, requires indeed grace from above. Yet Christians do not for a moment doubt the resurrection; and their belief in this respect is founded on *a rock* that is according to infidels, on prejudices they have never examined, and to which, from early infancy, their spiritual guides have prudently attached the greatest importance. They teach them to immolate on the alter of faith, reason, judgment, and good sense:—After this sacrifice, it is no longer difficult to make them acknowledge, without enquiry, the most palpable absurdities for truths, on which it is not permitted even to be sceptical.

It is in vain, that people of sense demonstrate the falsity of these pretended truths; it is in vain, that an intelligent critic stands up against interested testimonies, visibly suggested by enthusiasm and imposture; it is in vain, that humanity exclaims against wars, massacres, and horrors without number, which absurd disputes on absurd dogmas have occasioned. They silence people by saying, that "it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nought the understanding of the prudent.—Where is the wise? Where are the scribes? (the doctors of the law). Hath not God made foolish the wisdom of this world by causing the foolishness of the gospel to be preached*?" It is by such declamations against reason and wisdom, that fanatics and impostors have succeeded in banishing good sense from the earth, and fashioning slaves who make a merit of subjecting reason to faith, of extinguishing a sacred torch, which would conduct them with certainty, on purpose to lead them astray in the darkness these interested guides know how to infuse into minds. To degrade reason is an outrage against God its author; and it is an outrage against man who is thereby reduced to the condition of brutes.

ECCE HOMO.

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৪ আষাঢ় রবিবার প্রাতঃকালে ৭৷৷০ সাড়ে সাত ঘন্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

* Cor, i, 9, &c,

উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে দান সংগ্রহ।

উড়িষ্যায় যে রূপ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে বোধ হয় তাহা কাহারই অবিদিত নাই। সম্প্রতি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে এই দুর্ভিক্ষে সাহায্য দান করিবার নিমিত্ত ৩১ বৈশাখ রবিবার প্রাতঃকালে দান সংগ্রহ হইয়া গিয়াছে। ঐ দিবস যত অর্থ সংগ্রহীত হইয়াছে তাহা হইতে ২৫০ টাকা আপাতত কটক ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট যে টাকা সঞ্চিত রহিয়াছে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া অবিলম্বে তথায় প্রেরণ করিতে হইবে। যে কেহ দয়াদ্র্র হৃদয়ে শ্রদ্ধা পুর্ব্বক যাহা কিছু উৎকল বাসী দিগের সাহায্য নিমিত্তে এই সমাজে প্রেরণ করিবেন, তাহা আমরা আদরের সহিত গ্রহণ করিব।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

প্রথম প্রকরণ—মুল্য ৷৷০ আট আনা।
দ্বিতীয় প্রকরণ—মুল্য ৷৷০ আট আনা।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের এক একটী শ্লোকের যেরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা সাধারণকে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার কতকগুলি লইয়া প্রথম প্রকরণ নামে পূর্ব্বে পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়, সম্প্রতি তাহার অবশিষ্ট গুলি একত্রিত করিয়া দ্বিতীয় প্রকরণ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকরণে পারলৌকিক সাধনের বিশেষ উল্লেখ আছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাশুল বার্ষিক বার আনা।
সম্বৎ ১৯২৩। কলিগতাব্দ ৪৯৬৭। ১৫ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

ষষ্ঠ কল্প
চতুর্থ ভাগ
আষাঢ় ১৭৮৮ শক।
২৭৫ সংখ্যা
৩৭ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদসংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য ত্রয়োদশানুবাকে অষ্টমং সূক্তং।
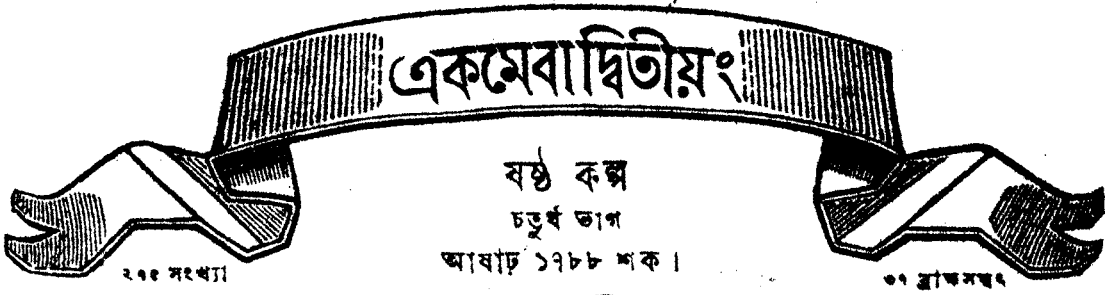
গোতমঋষিঃ পংক্তিচ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

৮৬৯

৬। যো অর্য্যো মর্ত্তভোজনং পরাদদাতি দাশুষে। ইন্দ্রো অস্মভ্যং শিক্ষতু বি ভজা ভূরি তে বসু ভক্ষীয় তব রাধসঃ।

৬। 'অর্য্যঃ' স্বামী পালয়িতা 'যঃ ইন্দ্রঃ' 'মর্ত্তভোজনং' মর্ত্ত্যৈঃ মনুষ্যৈরুপভোজ্যমন্নং 'দাশুষে' চরুপুরোডাশাদীনি দত্তবতে যজমানায় 'পরাদদাতি' প্রযচ্ছতি। সঃ ইন্দ্রঃ 'অস্মভ্যং' 'শিক্ষতু' তাদৃশমন্নং দদাতু। হে ইন্দ্র অস্মভ্যং দাতুং ধনং 'বিভজ' বিভক্তং কুরু। যতঃ 'তে' তব 'বসু' ধনং 'ভূরি' বহুলমসংখ্যাতং। অতঃ 'তব' 'রাধসঃ' ধনস্যৈকদেশং 'ভক্ষীয়' ভজেয় প্রাপ্নুয়াং।

৬। যে প্রতিপালক ইন্দ্র যজমানকে মনুষ্যগণের উপভোগ্য অন্ন প্রদান করিয়া থাকেন, তিনি আমাদিগকে অন্ন প্রদান করুন। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে দান করিবার নিমিত্ত ধন বিভাগ কর। তোমার ধনের সংখ্যা নাই। এই নিমিত্ত আমরা তোমার ধনের একদেশ প্রার্থনা করি।

৮৭০

৭। মদে মদে হি নো দদির্যূথা গবামৃজুক্রতুঃ। সংগৃভায় পুরূ শতোভয়াহস্ত্যা বসু শিশীহি রায় আভর।

৭। 'মদে মদে' সোমপানেন হর্ষে হর্ষে সতি 'ঋজুক্রতুঃ' ঋজুকর্ম্মা সঃ ইন্দ্রঃ 'নঃ' অস্মভ্যং 'গবাং' 'যূথা' যূথানি 'দদির্হি' গোযূথানাং দাতা খলু। হে ইন্দ্র স ত্বং 'পুরূ' পুরূণি প্রভূতানি 'শতা' শতসংখ্যাকানি অপরিমিতানীত্যর্থঃ। 'বসু' বসূনি ধনানি 'উভয়া হস্ত্যা' উভাভ্যাং হস্তাভ্যাং 'সংগৃভায়' অস্মভ্যং দাতুং সম্যক গৃহাণ। 'শিশীহি' অস্মাংস্তীক্ষ্ণী কুরু। নিশিতবুদ্ধিযুক্তান কুর্ব্বিত্যর্থঃ। 'রায়ো' ধনানি হস্তযোঃ স্থিতানি 'আভর'। আহর প্রযচ্ছ।

৭। সেই অকুটিলকার্য্যনিরত ইন্দ্র সোমপান দ্বারা চিত্তের প্রফুল্লতা উৎপন্ন হইলে আমাদিগকে গোযূথ প্রদান করিয়া থাকেন। এক্ষণে তিনি অপরিমিত অর্থ দুই হস্তে গ্রহণ ও আমাদিগকে প্রদান করুন এবং আমাদিগকে সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন করিয়া দিন।

৮৭১

৮। মাদয়স্ব সুতে সচা শবসে শূর রাধসে। বিদ্মা হি ত্বা পুরূবসুমুপ কামান্ সসৃজ্মহেঽথা নোঽবিতা ভব।

৮। হে 'শূর' শৌর্য্যবন্নিন্দ্র 'সুতে' সোমে অভিষুতে সত্যাগত্য 'সচা' অস্মাকং সখা সন্ 'মাদয়স্ব' তেন সোমেন তৃপ্তো ভব। কিমর্থং। 'শবসে' বলার্থং 'রাধসে' অস্মাকং ধনার্থং চ। 'ত্বা' ত্বাং 'পুরূবসুং' বহুধনং 'বিদ্ম হি' বয়ং জানীম খলু। অতোঽস্মদীয়ান 'কামান' মাত্রা গবা বৎসানিব ত্বয়া 'উপসসৃজ্মহে' 'হি'। ত্বয়া খলুৎকীকুর্ম্মঃ। 'অথ' অনন্তরং 'নঃ' অস্মাকং 'অবিতা' অভিলষিতফলপ্রদানেন রক্ষিতা 'ভব'।

৮। হে বীর! সোমরস সংস্কৃত হইলে তুমি আগমন পূর্ব্বক আমাদিগের সখা হইয়া তোমার বলাধান ও আমাদিগকে অর্থ দানের নিমিত্ত তদ্দ্বারা তৃপ্তি লাভ কর। আমরা তোমাকে প্রভূত ধন-শালী বলিয়া জ্ঞাত আছি। এই নিমিত্ত আমরা প্রার্থনা সমুদয় তোমাকে অবগত করিতেছি। তুমি আমাদিগের রক্ষক হও।

৮৭২

৯। এতে তইন্দ্র জন্তবো বিশ্বং পুষ্যন্তি বার্য্যং। অন্তর্হি খ্যো জনানামর্য্যো বেদো অদাশুষাং তেষাং নো বেদ আভর।১।৬।২।

৯। হে 'ইন্দ্র' 'তে' তব স্বভূতাঃ 'এতে' 'জন্তবঃ' যজমানলক্ষণাজনাঃ 'বিশ্বং' সর্ব্বং 'বার্য্যং' সর্ব্বৈঃ সম্ভজনীয়ং হবিঃ 'পুষ্যন্তি'। বর্দ্ধয়ন্তি। 'অদাশুষাং' হবিষামদাতৄণাং জনানাং 'অন্তঃ' মধ্যে বিদ্যমানং 'বেদঃ' ধনং 'অর্য্যঃ' সর্ব্বেষাং স্বামী ত্বং 'খ্যোহি' পশ্যসি হি জানাসীত্যর্থঃ। 'তেষাং' অযজমানানাং 'বেদঃ' ধনং নোঽস্মভ্যং 'আভর' আহর। প্রযচ্ছেতি যাবৎ। অযজমানেষু বিদ্যমানং ধনং যাগানুপযুক্তত্বাদ্ব্যর্থমেব ভবেৎ অতস্তস্য ধনস্য স্বার্থকত্বায় তদীয়ং ধনং অপহৃত্য যজমানেভ্যঃ প্রযচ্ছেতি তাৎপর্য্যার্থঃ।১।৬ ২।

৯। হে ইন্দ্র! তোমার এই যজমানেরা সকলের স্পৃহনীয় হবি পরিবর্দ্ধিত করিতেছেন। হে প্রভো! যাহারা হবি প্রদান করে না, তাহাদিগের যে ধন বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা তুমি জ্ঞাত হইতেছ, অতএব তাহাদিগের ধন আমাদিগকে প্রদান কর।১।৬।২।

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ।

৩ বৈশাখ রবি বার ১৭৮৮ শক।

প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

আমরা এই সংসারের মোহ-কোলাহলের মধ্যে সেই ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইয়াছি। চতুর্দ্দিকে মোহ-কোলাহল, বিবাদ, বিসম্বাদ, অসূয়া, পরনিন্দা; তার মধ্যে আমরা বিগত-বিবাদ পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছি। দ্বেষ, গ্লানি, পাপ-তাপের মধ্যে—সংসারের কুটিলতার মধ্যে আমরা ধর্ম্মাবহ পাপনুদ পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছি। যখন দেখি ধর্ম্মের নামে চতুর্দ্দিকে অধর্ম্ম আচরিত হইতেছে, যখন দেখি হাস্যোল্লাসে দিবা রাত্রি অতিবাহিত হইতেছে; তখনি আমরা পবিত্র-স্বরূপের শরণাপন্ন হইয়া পরিত্রাণ পাইয়াছি। আমরা এই প্রত্যাশায় তাঁর নিকটে আসিয়াছি, যে অন্তরের মোহ-কোলাহল হইতে আত্মা মুক্ত হইবে, বিদ্বেষ গ্লানি হইতে আত্মা মুক্ত হইবে, অপবিত্রতা হইতে আত্মা মুক্ত হইবে—এই ভরসায় আমরা সেই পবিত্র-স্বরূপের শরণাপন্ন হইয়াছি, আমাদের আর কিছুরই প্রার্থনা নাই। কেবল এই মাত্র প্রার্থনা, যাহাতে সেই পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বরকে পবিত্র হইয়া উপাসনা করিতে পারি, যাহাতে একাগ্র-মনে পবিত্র হৃদয়ে প্রীতি ভক্তি তাঁহাতে অর্পণ করিতে পারি, যাহাতে ব্রহ্মের শরণা-

পন্ন হইয়া ব্রাহ্ম হইতে পারি। এই আশ্বাসে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, ব্রাহ্মধর্ম্মও আমারদিগকে আশার অতীত ফল প্রদান করিতেছেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গঙ্গা নদীর ন্যায় আমারদিগকে সকল সময়ে সংসারতাপ হইতে শীতল করিতেছেন, আমারদিগের জ্ঞান তৃষ্ণা শান্তি করিতেছেন—ব্রাহ্মধর্ম্ম গঙ্গা-স্রোতের ন্যায় আনন্দপ্রবাহ আমারদের আত্মাতে চিরকাল বিধান করিতেছেন। আমরা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া অবধি তাঁরি আনন্দে আনন্দিত হইতেছি। তাঁর নিকটে গিয়া আত্মা পবিত্র হইতেছে, তাঁর উপাসনায় আত্মা বলী হইতেছে। আমরা ক্ষুধিত হইয়া তাঁর নিকট চাহিয়াছি, তিনি জ্ঞানের অন্ন সত্য দিয়া আমারদের ক্ষুধা শান্তি করিয়াছেন। যখনি পাপে মলিন হইয়া পবিত্রতার জন্য সন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁর নিকট দণ্ডায়মান হইয়াছি, তিনি পাপ-মলিনতা হইতে মুক্ত করিয়াছেন; যখনি দুর্ব্বল হইয়া আত্মার বীর্য্যের নিমিত্তে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছি, তিনি দুর্ব্বল আত্মাতে বলাধান করিয়াছেন। তিনি আমারদের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন—এমন সুহৃদ্ এমন বন্ধু আর কে কোথায় দেখিয়াছে? আমরা যাহার জন্য তাঁর নিকট আসিয়াছিলাম, তিনি তাহা সম্পূর্ণ-রূপে দিয়াছেন। তিনি গুরু হইয়া জ্ঞান দিয়াছেন, পিতা হইয়া অন্ন দিয়াছেন, মাতা হইয়া স্নেহ দিয়াছেন—কাহার সাধ্য, তাঁহা হইতে আমারদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে। আমরা তাঁর সঙ্গে আত্মার যোগে যে আনন্দ-রস পান করিতেছি, তাঁর দক্ষিণ মুখ দর্শন করিয়া যে ধর্ম্ম-বল লাভ করিতেছি; তাহা হইতে আমারদিগকে আর কে বঞ্চিত করিবে? আমরা যখন তাঁহাকে আমারদের হৃদয়ে দেখিতেছি, আত্মার অধিপতি-রূপে তাঁহাকে দেখিতেছি; তখন আমারদের কি ভয়, কি শোক, কি মোহ। তিনি চির কাল আমারদিগকে দুঃখ বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেছেন, পাপ-তাপ হইতে মুক্ত করিতেছেন। যে আশা করিয়া আমরা তাঁর শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, তিনি তাহা হইতে সহস্র গুণে অধিক ফল বিতরণ করিতেছেন। তিনি আপনি গুরু হইয়া প্রতি দিন জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন—তিনি আমারদের বুদ্ধিতে সত্য প্রেরণ করিতেছেন, তিনি আমারদের হৃদয়ে পবিত্রতা বিধান করিতেছেন, তিনি আমারদের আত্মাকে উন্নত করিয়া আপনার পবিত্র মঙ্গল-রাজ্যে গ্রহণ করিতেছেন। যখন প্রথম আসিয়া তাঁর শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, অন্ধকারের মধ্যে তাঁহাকে পাইবার জন্যে ব্যস্ত হইয়াছিলাম—তখন এত ফল পাইব, জানিতাম না। ক্রমে যত দেখিতেছি, দেখিতেছি তাঁহার করুণার শেষ নাই—তিনি মাতার ন্যায় নিয়ত করুণা বর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে বিপদের মধ্যে আমারদের আত্মা সহস্র গুণ বল ধারণ করে, মৃত্যু আমারদিগকে ভয় দিতে পারে না, শোক সন্তাপে আমরা মুহ্যমান হই না। এখানে চতুর্দ্দিকে বাক্-বিতণ্ডা হউক, আমরা ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া আছি। তাঁর প্রেম দৃষ্টির উপর চাহিয়া থাকিলে সকল সত্তা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, তাঁহাকে হৃদয় দিলে হৃদয় পবিত্র হয়—কার সাধ্য, সে পবিত্রতা অপহরণ করিতে পারে। যদি শত্রু আসিয়া এ শরীর হইতে হৃদয়কে কাটিয়া ফেলিয়া দেয়, সে হৃদয় ঈশ্বরের ক্রোড়েই সুখে সুপ্ত থাকে; যদি শিরশ্ছেদন করে, প্রাণ প্রাণের প্রাণকে লইয়া তাঁহার মহিমা ব্যক্ত করে। যে অনন্ত প্রভা ভূলোক হইতে দ্যুলোককে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে, তাহার মূল

এই আত্মাতে প্রাণ-রূপে সন্নিবিষ্ট আছে—শিরশ্ছেদন করিলেও আত্মাতে সেই প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বরের সত্তা থাকিবে; আমারদের হৃদয়কে শরীর হইতে দূর নিঃক্ষেপ করিলেও সেই হৃদয়ে তাঁহার করুণা প্রকাশিত রহিবে। আমারদের প্রাণে তাঁহার করুণা এত বদ্ধমূল হইয়াছে যে শরীর-নাশেও এই প্রাণের উপর তাঁর করুণার হ্রাস হইবে না। আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছি। সেই পরমেশ্বর দিন দিন সত্য আমারদিগের নিকটে প্রেরণ করিতেছেন। প্রথমে আমরা তত কিছুই জানিতাম না। আমরা তাঁহারই প্রসাদে তাঁহাকে জানিলাম। তিনিই আমারদের মনে তাঁহার অনুরাগ প্রেরণ করিলেন এবং তিনিই স্বয়ং তাহার বিষয় হইয়া আমারদের জ্ঞানেতে প্রকাশ পাইলেন। গ্রন্থে যে সত্য পাই নাই, সে সত্য তখন তাঁহার উপদেশে লাভ করিলাম। তখন জ্ঞান তৃপ্ত হইল, হৃদয়-সরোবর পূর্ণ হইল, সকল স্থানে তাঁহার মহিমা দর্শন করিতে লাগিলাম। তখন বুঝিলাম, যিনি আমার ঈশ্বর; তিনি সকল দেশের ঈশ্বর, তিনি সকল কালের ঈশ্বর—তিনি সকলের গুরু, সকলের পিতা, সকলের মাতা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ।

৭ জ্যৈষ্ঠ রবিবার ১৭৮৮ শক।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদের আত্মার অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে নিয়মিত করিতেছ, জগৎ সংসারের অভ্যন্তরে থাকিয়া জগৎকে নিয়মিত করিতেছ। তুমি অজ আত্মা, মহানাত্মা। তোমার আশ্রয়ে সকলে আপনাপন কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছে। তোমার কর্ম্মে যার অভিরুচি, তার কর্ম্ম পরিশুদ্ধ। তোমার হস্ত যে সর্ব্বত্র দেখিতেছে, তোমার কার্য্য যে সর্ব্বত্র পরীক্ষা করিয়াছে, সে তোমাকে ছাড়িয়া কোন কর্ম্ম করিতে চায় না; আপনার ক্ষুদ্র ভাব তার নিকট কুৎসিত ভাব ধারণ করে, তোমারই মহান্ ভাব তার নিকটে সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে। আপনার পাপাসক্ত আত্মাকে দেখি, হৃদয় গ্লানিযুক্ত হয়; তোমার পবিত্রতা দেখিয়া হৃদয় পরিষ্কৃত হয়। আপনার দুঃখ শোকে আত্মা মিয়মাণ হয়, তোমার আনন্দভাব দেখিয়া আত্মা আনন্দিত হয়। হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদের সর্ব্বস্ব। আমরা তোমার হস্ত, তোমার কার্য্য দেখিয়া তোমাকে অনুসরণ করি; তোমার মঙ্গলভাবের অনুকরণ যতটুকু করিতে পারি, তাহাতেই আমারদের আনন্দ। তোমার সঙ্গে আত্মার নিত্য যোগ—তুমি সর্ব্বদাই হৃদয়ে মধুময় উপদেশ প্রদান করিতেছ। যাহাতে আমারদের সকলি মঙ্গলে পরিণত হয়, তুমি এই প্রকার উপদেশ নিয়ত প্রদান করিতেছ। আমরা এখানে মর্ত্ত্য জীব হইয়া—রোগে আতুর শোকে কাতর হইয়াও যে তোমার উপদেশ-বাক্য শুনিয়া দিন দিন উন্নত হইতেছি, ইহা হইতে আমারদের সৌভাগ্য আর কি আছে। যখন তোমার কথা শুনিতে পাইতেছি, তখন কেন পরের কথা শুনিতে যাইব। তুমি যখন নিজে সেই সত্য বাক্য, বিশুদ্ধ মঙ্গল বাক্য, আমারদের বুদ্ধিতে প্রেরণ করিতেছ; তখন কেন তাহা স্তব্ধ হইয়া না শুনিব? কর্ণকে সেই দিকে কেন না নিযুক্ত রাখিব? যখন যত্ন করিলেই জানিতে পারি, তখন তোমারি মুখ হইতে সত্য ভাব কেন না জানিতে চেষ্টা করিব? তুমি নিয়তই উপদেশ প্রদান করিতেছ, নিয়তই ধর্ম্ম-বল প্রেরণ করিতেছ,

তাহাতেই আমরা দণ্ডায়মান আছি; নতুবা যষ্টির ন্যায় ভূমিতে পতিত হইতাম। তুমি যে উপদেশ প্রদান কর, তাহাই আমারদের শিক্ষণীয়; তুমি যে কর্ম্মে আমারদিগকে নিযুক্ত কর, তাহাই আমারদের পালনীয়। পরিত্যাগ করিও না, হে পরমেশ্বর! এই বিষম সংসারে আমারদিগকে পরিত্যাগ করিও না। তোমার আশ্রয় লইতেছি, তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, আমারদিগকে তোমার মাতৃ-ক্রোড়ে গ্রহণ কর—মহা বিঘ্ন বিপত্তি কোলাহল তোমা হইতে আমারদিগকে বিযুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে। হে করুণাময়! রক্ষা কর, যেন তোমা হইতে আমারদিগকে কেহই বিচ্যুত করিতে না পারে, যেন তোমাকে সাক্ষাৎ পিতা মাতা জানিয়া তোমারই কর্ম্ম করিতে থাকি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

তত্ত্ববিদ্যা।

তৃতীয় অধ্যায়।

বুদ্ধি-ঘটিত মূলতত্ত্ব।

বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান-বিশেষ উপার্জ্জন করিতে গেলে—জ্ঞাতা [বিষয়ী আছে এবং জ্ঞাতব্য বিষয় আছে—এই দুইটি প্রত্যয় অলঙ্ঘনীয় রূপে আবশ্যক। ইন্দ্রিয়-ব্যাপার সংঘটন-পক্ষে দেশ কালে প্রত্যয় করা যেমন আবশ্যক, বুদ্ধি-ক্রিয়া সংসাধন পক্ষে বিষয় বিষয়ীতে প্রত্যয় করা সেই রূপ আবশ্যক। যে জানিতেছে, সেই মুখ্য রূপে বিষয়ী ও যাহাকে জানা হইতেছে, তাহাই মুখ্য রূপে বিষয়। যাহাকে আমরা চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি তাহা বিষয়ী নহে, কিন্তু যে চক্ষু দ্বারা দেখিতেছে সেই বিষয়ী; যাহাকে আমরা দেহান্তর্গত অবস্থা বিশেষ বলিয়া অন্তঃকরণে অনুভব করিতেছি তাহা বিষয়ী নহে, কিন্তু যে উক্ত প্রকার অনুভব করিতেছে সেই বিষয়ী; সুখের অবস্থা বিষয়ী নহে, কিন্তু আপন সুখের অবস্থাকে যে জানিতেছে সেই বিষয়ী; ভয়ের অবস্থা বিষয়ী নহে, কিন্তু ভয়ের অবস্থাকে যে জানিতেছে সেই বিষয়ী—এই রূপ দেখা যাইতেছে যে ভৌতিক বস্তু দূরে থাকুক, অন্তঃকরণের কোন অবস্থা বিশেষও বিষয়ী পদবীর যোগ্য নহে। তাহাই বিষয়ী, যাহা আন্তরিক তাবৎ অবস্থারই মূলে জ্ঞাতা রূপে অবস্থান করে। বিষয়ী আছে অর্থাৎ আমাদের স্ব স্ব আত্মা আছে, ইহা একটি যৎপরোনাস্তি অবিতথ সত্য। "আমি আছি" ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। যে ব্যক্তি বলে যে "আমি নাই" সে যদি বাস্তবিকই না থাকে, তবে "আমি নাই" একথা কে বলিতেছে? যদি "আমি" না থাকে তবে "আমারও" কাযে কাযে থাকিতে পারে না। আমি নাই অথচ যে কথা উক্ত হইল তাহা আমার কথা, আমি নাই অথচ এটি আমার—এ দুইটি বিরোধী কথা একত্রে কিরূপে রক্ষা পাইতে পারে? অতএব আমি আছি, ইহা একেবারেই সংশয়রহিত। বহির্ব্বস্তু আছে, ইহাও ঐ প্রকার সংশয়রহিত; কেন না ইহা একেবারে অবশ্যম্ভাবী যে, বিষয়ী বিষয়ের মধ্যে বিভিন্নতা নির্দ্দেশ ব্যতিরেকে বুদ্ধি-ক্রিয়া এক মুহূর্ত্তও চলিতে পারে না। এরূপ নহে যে এ তত্ত্বটি কোন কোন স্থলে সংলগ্ন হয়, এবং কোথায়ও কোথায়ও নাও সংলগ্ন হইতে পারে; উহা পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নহে; সুতরাং উহা যে একটি প্রজ্ঞানিহিত মূল তত্ত্ব, ইহাতে আর সংশয় হইতে পারে না। এই মূলতত্ত্ব অনুসারে ইহা

একান্ত আবশ্যক যে একেকে জানিতে হইলে অনেককেও সঙ্গে সঙ্গে জানা চাই, বিষয়ীকে জানিতে হইলে বিষয়কেও সঙ্গে সঙ্গে জানা চাই, ইত্যাদি; কেন না এক অনেক হইতে বিভিন্ন ও অনেক এক হইতে বিভিন্ন, এই রূপ বিভিন্নতা থাকাতেই এক এবং অনেক উভয়েরই অর্থ হইতে পারিতেছে। এতদ্ব্যতীত এক হইতে অভিন্ন অনেক, অথবা অনেক হইতে অভিন্ন এক; বিষয়ী হইতে অভিন্ন বিষয় অথবা বিষয় হইতে অভিন্ন বিষয়ী; ইহা কোন প্রকারেই বোধ সাধ্য নহে। যখন আমরা জানিতেছি যে আত্মা আছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানিতেছি যে এমন ও সকল বস্তু আছে যাহা আত্মা হইতে বিভিন্ন; এইটি আত্মা এবং এইটি আত্মা নহে—এই রূপেই আত্মার নির্দ্দেশ; সুতরাং আত্মা আছে কিন্তু বহির্ব্বস্তু নাই, ইহা অসম্ভব।

এখানে এই একটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে কথিত বিভিন্নতার নিয়ম যদি সর্ব্বথা অলঙ্ঘনীয় হয়, তবে ইহা কি রূপে সম্ভব হইল যে পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন, তদ্ভিন্ন আর কিছুই ছিল না? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে ইহা অবশ্য সত্য বলিতে হইবে যে বর্ত্তমান সময়ে ঈশ্বর আপনাকে সৃষ্ট জগৎ হইতে বিভিন্ন রূপে জানিতেছেন; ইহাও সেই রূপ সত্য যে সৃষ্টির পূর্ব্বেও ঈশ্বর আপনার সংকল্প-গত ভাবি সৃষ্ট জগৎ হইতে আপনাকে বিভিন্ন রূপে জানিতেন। ঈশ্বর কোন কালেই অসাড় ভাবে ছিলেন না, কেন না জ্ঞান, ইচ্ছা, উদ্যম, সংকল্প, এ সকলকে ঈশ্বর হইতে বিযুক্ত করিয়া লইলে কি আর অবশিষ্ট থাকে? ঈশ্বরের নিকট ভুত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সকল কালই সমান; অর্থাৎ তাঁহার যে মঙ্গল সংকল্প তাহা পূর্ব্বে যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে এবং পরেও তেমনি থাকিবে; অতএব ঈশ্বর আপন মঙ্গল-সংকল্প-সমুদ্ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অথবা ভুত জগৎ হইতে চিরকালই আপনাকে বিভিন্ন করিয়া জানিতেছেন, তাহাতে আর কিছু মাত্র সংশয় নাই।

বিষয়ীর অবয়ব তিনটি—জ্ঞান, ভাব এবং ইচ্ছা; বিষয়-বিশেষকে জানিবার সময় এই তিন অবয়বই কার্য্যে লাগে। জ্ঞাতব্য বিষয়ের ইয়ত্তা থাকা (অর্থাৎ একত্ব অনেকত্ব থাকা) জ্ঞানের পক্ষে মুখ্য রূপে আবশ্যক; জ্ঞাতব্য বিষয়ের লক্ষণ (যথা সুলক্ষণ বা কুলক্ষণ) থাকা ভাবের পক্ষে মুখ্য রূপে আবশ্যক; জ্ঞাতব্য বিষয়ের শক্তি (যথা ভাল করিবার ক্ষমতা অথবা মন্দ করিবার ক্ষমতা) থাকা ইচ্ছার পক্ষে মুখ্য রূপে আবশ্যক। কাষ্ঠ লোষ্ট সদৃশ যে বস্তুর লক্ষণ এবং শক্তি আমাদের নিকটে নিতান্তই উপেক্ষণীয়, তাহা এক বা অনেক ইহা জানাতে কেবল জানা মাত্রই হয়, কেবল জ্ঞানই চরিতার্থ হয়, পরন্তু ভাব বা ইচ্ছার পক্ষে কিছুই ফল দর্শে না। আমরা যখন বস্তু-বিশেষের লক্ষণ অবগত হই, তখনই ভাব বিশেষের উদ্দীপন হয়—সুলক্ষণ দেখিলেই আমাদের মনে আনন্দ উপস্থিত হয়, কুলক্ষণ দেখিলেই ঘৃণা উপস্থিত হয়। একত্ব অনেকত্ব অনুসারে আমরা বস্তু-বিশেষকে সংক্ষেপে অথবা বাহুল্য-রূপে জ্ঞানে ধারণ করি, সুলক্ষণ কুলক্ষণ অনুসারে তাহাকে হেয় বা উপাদেয় রূপে ভাবে অনুভব করি; উদাহরণ—অশ্বগবাদি নানা জন্তুকে আমরা পশু বলিয়া সংক্ষেপে জানি, অথবা অশ্বগবাদির প্রত্যেককে সবি-

শেষে জানিয়া পশু-বিষয়ে বাহুল্য রূপে জ্ঞান লাভ করি; সুগন্ধ লক্ষণকে আমরা উপাদেয় রূপে অনুভব করি, দুর্গন্ধ লক্ষণকে আমরা হেয় রূপে অনুভব করি। আমরা যখন বস্তু-বিশেষের শক্তি-বিশেষ অবগত হই, তখনই ইচ্ছা আপন লক্ষ সাধনে তৎপর হয়। সুরাপায়ীর পক্ষে সুরা অতীব উপাদেয় হইলেও উক্ত ব্যক্তি যখন জানিতে পারে যে সুরাতে আয়ুঃ শোষিণী শক্তি অবস্থান করে, তখন ইচ্ছা অমনি সুরাপানের প্রতিবাদী হইয়া দণ্ডায়মান হয়; যখন রোগী ব্যক্তি জানিতে পারে যে তিক্ত ঔষধ-বিশেষে আরোগ্য-দায়িনী শক্তি অবস্থান করে, তখন উক্ত সামগ্রী রসনাতে অতীব হেয় হইলেও ইচ্ছা তাহা সেবন করিতে অগ্রসর হয়। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে জ্ঞানের পক্ষে ইয়ত্তা যেমন আবশ্যক, ভাবের পক্ষে লক্ষণ তেমনি আবশ্যক, ইচ্ছার পক্ষে শক্তি তথৈব আবশ্যক। ইহার এই একটি স্পষ্ট উদাহরণ—আমরা জ্ঞান মাত্র দ্বারা আত্মাকে উহার লক্ষণ এবং শক্তি হইতে পৃথক্ করিয়া উহাকে কেবল "এক" বলিয়া অবধারণ করিতে পারি এবং এই রূপ উহাকে এক বলিয়া না জানিলে উহাকে জানাই হয় না; কিন্তু এ রূপ জানাতে আমাদের ভাবে আনন্দও উদয় হয় না, ইচ্ছাতে স্বাধীনতাও প্রকাশ পায় না; পরন্তু এরূপ জানা কেবল জানা মাত্র সার। কিন্তু যখন আমরা আত্মাকে সত্য-পরায়ণ, কৃতজ্ঞ, সাধু, পবিত্র, ইত্যাদি সর্ব্ব-সুলক্ষণযুক্ত বলিয়া অনুভব করি, তখন আমারদের ভাবে আনন্দ আবির্ভূত হয়; এবং যখন ইন্দ্রিয়াদির উপরে আত্মার শক্তির প্রাদুর্ভাব উপলব্ধি করি, তখন আমারদের ইচ্ছাতে স্বাধীনতা আবির্ভূত হয়। এই রূপ ইয়ত্তা, লক্ষণ এবং শক্তি; এই তিনের সম্বন্ধে জ্ঞান, ভাব এবং ইচ্ছার পৃথক্ পৃথক্ প্রাধান্য স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।

ইয়ত্তা-বিষয়ে বিষয়ীর সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ এই যে, একই বিষয়ী নানা বিষয় জ্ঞাত হয়—এক বিষয়ের সহিত অন্য বিষয়ের বিভিন্নতা নির্দ্দেশ করিতে না পারিলে উভয়ের কোনটিকেই জানা হইতে পারে না। একটা বৃক্ষকে জানিতে হইলে মৃত্তিকা, পাষাণ, জীব জন্তু প্রভৃতি এমন একটা কোন সামগ্রীকে জানা আবশ্যক, যাহা বৃক্ষ হইতে বিভিন্ন; সুতরাং জ্ঞানের সম্বন্ধে বিষয় অনেক না হইলে কোন রূপেই নিস্তার নাই। অতএব আমাদের জ্ঞানের সম্বন্ধে বিষয়ী এক ও বিষয় অনেক—সুতরাং বিষয়ের সম্বন্ধে বিষয়ী এক এবং বিষয়ীর সম্বন্ধে বিষয় অনেক। দ্বিতীয়তঃ বিষয় এবং বিষয়ী উভয়ের সম্বন্ধ-মূলক যে জ্ঞান, তাহাতে একত্ব অনেকত্ব উভয়ই বিদ্যমান; বিষয়ের গুণে জ্ঞানকে যেমন অনেক বলিয়া গণ্য করিতে হয়, বিষয়ীর গুণে সেই রূপ উহাকে এক বলিয়া নিশ্চয় করিতে হয়। এক দিকে অশ্ব জ্ঞান, হস্তি জ্ঞান, প্রভৃতি নানা জ্ঞান, অপর দিকে একই আত্মজ্ঞান। এই রূপ সকল জ্ঞানেরই এই এক অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ যে উহারা অনেকে এক সূত্রে গ্রথিত; সুতরাং বিষয় এবং বিষয়ীর সম্বন্ধ-মূলক যে জ্ঞান, তাহা এক এবং অনেক উভয়েরই সন্ধিস্থল, তাহা সমষ্টি শব্দের বাচ্য। অতএব ইয়ত্তা বিষয়ে বুদ্ধি-ঘটিত মূলতত্ত্ব এই তিনটি—বিষয়ের সম্বন্ধে বিষয়ী এক, বিষয়ীর সম্বন্ধে বিষয় অনেক, এবং উভয়ের সম্বন্ধ মূলক যে জ্ঞান, তাহা সমষ্টি-বদ্ধ।

দ্বিতীয়তঃ—লক্ষণ-বিষয়ে বিষয়ের সহিত বিষয়ীর এই রূপ সম্বন্ধ যে বিষয়ীতেই জ্ঞান-

লক্ষণের সত্তা এবং বিষয়েতে উক্ত লক্ষণের অভাব অবস্থান করে; অতএব জ্ঞান-সম্বন্ধে বিষয় অভাবাত্মক, বিষয়ী ভাবাত্মক; সুতরাং বিষয়ীর সম্বন্ধে বিষয় অভাবাত্মক, বিষয়ের সম্বন্ধে বিষয়ী ভাবাত্মক। দ্বিতীয়তঃ বিষয় এবং বিষয়ীর সম্বন্ধ-মূলক যে জ্ঞান তাহা এক দিকে আত্মাকে জানে এক দিকে বিষয়কে জানে। আলোককে জানা সম্বন্ধে আপেক্ষিক অন্ধকারকে জানা যেমন অভাবাত্মক, বিষয়ীকে জানা সম্বন্ধে বিষয়কে জানাও সেই রূপ অভাবাত্মক; সুতরাং জ্ঞান, এক দিকে যেমন ভাবাত্মক, অপর দিকে উহা তেমনি অভাবাত্মক; এক অনেক এ দুয়ের সন্ধিস্থলে যেমন সমষ্টি, ভাবাত্মক এবং অভাবাত্মক এ দুয়ের সন্ধিস্থলে সেই রূপ সীমাত্মক। উদাহরণ যথা—সূর্য্যের তুলনায় প্রদীপে আলোকের অভাব আছে, এবং খদ্যোতের তুলনায় উহাতে আলোকের সত্তা আছে; এ অবস্থায় ইহা যেমন বলা যাইতে পারে না যে প্রদীপে আলোকের অভাব আছে, ইহাও সেই রূপ বলা যাইতে পারে না যে প্রদীপে আলোকের অভাব নাই; প্রত্যুত ইহাই বলা যাইতে পারে যে উহাতে আলোকের সীমা আছে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে সীমাত্মক-জ্ঞাই ভাব এবং অভাব দুয়ের সন্ধিস্থল। অতএব লক্ষণ-বিষয়ে যুক্তি-ঘটিত মূলতত্ত্ব এই তিনটি—যথা বিষয়ী বিষয়ের সম্বন্ধে ভাবাত্মক, বিষয় বিষয়ীর সম্বন্ধে অভাবাত্মক, এবং উভয়ের সম্বন্ধ মূলক যে জ্ঞান, তাহা সীমাত্মক।

তৃতীয়তঃ—শক্তি-বিষয়ে বিষয়ীর সহিত বিষয়ের এই রূপ সম্বন্ধ যে বিষয়ী আপনা কর্ত্তৃক জ্ঞাত হয়, এবং বিষয় অন্য কর্ত্তৃক (অর্থাৎ বিষয়ী কর্ত্তৃক) জ্ঞাত হয়। "জানা" একটি ক্রিয়া, এবং জ্ঞাত হওয়া সেই ক্রিয়ার কার্য্য অথবা ফল, ও যে শক্তি দ্বারা জ্ঞান-ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই জ্ঞান-শক্তি। বিষয়ী আপনারই জ্ঞান-শক্তি দ্বারা জ্ঞাত হয়, বিষয় অন্যের জ্ঞান-শক্তি দ্বারা জ্ঞাত হয়; সুতরাং জ্ঞাত হওয়া সম্বন্ধে বিষয়ী আপনার উপর নির্ভর করে, বিষয় অন্যের উপর নির্ভর করে। অতএব বিষয়ের সম্বন্ধে বিষয়ী স্বাধীন অর্থাৎ আপনার অধীন এবং বিষয়ীর সম্বন্ধে বিষয় পরাধীন। পুনশ্চ আমরা যে কোন বস্তুকে জানি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে জানিতেই হয়। যখন একখান পুস্তককে জানিতেছি, তখন ইহাও সঙ্গে সঙ্গে জানিতেছি যে আমিই উক্ত পুস্তককে জানিতেছি। আমারদের জ্ঞান কখনও অশ্বকে জানিতেছে, কখন নাও জানিতেছে; কখনো হস্তিকে জানিতেছে, কখনো নাও জানিতেছে; কিন্তু উহা আপনাকে সর্ব্বদাই জানিতেছে; কেননা জ্ঞান যাহা কিছু জানে, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই উহা আপনাকে জানে। এরূপ হইতে পারে যে এক ব্যক্তির অশ্ব জ্ঞান নাই, অথচ তাহার আত্ম-জ্ঞান আছে; কিন্তু ইহা কদাপি হইতে পারে না যে এক ব্যক্তির আত্ম-জ্ঞান নাই অথচ তাহার অশ্ব জ্ঞান আছে। অতএব আত্ম-জ্ঞান আপনারই গুণে স্থিতি করিতেছে; সুতরাং ইহা স্বাধীন এবং এই আত্ম জ্ঞানেরই গুণে অন্যান্য বিশেষ বিশেষ জ্ঞান স্থিতি করিতেছে; সুতরাং ইহারা পরাধীন। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে বিষয় এবং বিষয়ী উভয়ের সম্বন্ধ-মূলক যে জ্ঞান, তাহাতে স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা উভয়ই যোগ-বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। স্বাধীন এবং পরাধীন দুয়ের সংযোগকে পরস্পরাধীন বলা যাইতে পারে। যথা—কোন সমাজ-ভুক্ত কতিপয় ব্যক্তিকে পরস্পরাধীন বলিলে ইহাই বলা হয় যে উহারা প্রত্যেকে উক্ত সমাজের

অধীন; সুতরাং সমাজান্তর্গত অন্যান্য ব্যক্তির অধীন এবং সমাজান্তর্গত আপনার অধীন; সুতরাং প্রত্যেকেই এক দিকে যেমন স্বাধীন, অন্যদিকে তেমনি পরাধীন। অতএব শক্তি-বিষয়ে বুদ্ধি-ঘটিত মূলতত্ত্ব এই তিনটি—যথা, বিষয়ের সম্বন্ধে বিষয়ী স্বাধীন, বিষয়ীর সম্বন্ধে বিষয় পরাধীন, এবং উভয়ের সম্বন্ধ-মূলক যে জ্ঞান, তাহা পরস্পরাধীন। যাহা বলা হইল, তাহা নিম্নের লতা দৃষ্টে সুন্দর-রূপে অবধারিত হইবে।

বিষয়ী	বিষয়	সম্বন্ধ
এক	অনেক	সমষ্টি
ভাবাত্মক	অভাবাত্মক	সীমাত্মক
স্বাধীন	পরাধীন	পরস্পরাধীন

এতক্ষণে ইহা সুস্পষ্ট হইল সন্দেহ নাই যে, একত্ব অনেকত্ব, ভাব অভাব, কার্য্য কারণ, এ সকল ভাব আমরা পরীক্ষা দ্বারা অর্জ্জন করি নাই, পরন্তু অমায়িক প্রজ্ঞার প্রসাদেই আমরা উহারদিগকে উপভোগ করিতে পাইতেছি। উহারা আমারদের স্বোপার্জ্জিত বিত্ত নহে, উহারা আমারদের পৈতৃক ধন; পরমপিতার করুণা-স্রোতেই উহারা প্রেরিত হইতেছে "ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ;"। যিনি আমারদের সাক্ষাৎ পিতা, যিনি আমাদের পুরাতন পিতামহ, তিনি স্বয়ং গোপনে গোপনে উক্ত ধন-সকল আমারদের হস্তে নিহিত করিতেছেন; আমরা প্রার্থনা করি নাই, অথচ আমাদের কিসে মঙ্গল হয় এই জন্য তিনি ব্যস্ত রহিয়াছেন।

একত্ব অনেকত্ব প্রভৃতি ভাব-সকল যদি স্বতঃ-সিদ্ধ-রূপে আমারদের আত্মাতে না থাকিত, তাহা হইলে আমরা সহস্র পরীক্ষা করিয়াও জানিতে পারিতাম না যে আমি এক এবং বহির্ব্বিষয় অনেক—আমাতে যাহার অভাব নাই, বহির্ব্বিষয়ে তাহার অভাব আছে—আমি স্বাধীন কারণ, বহির্ব্বিষয় পরাধীন কার্য্য; এবং এই কয়টি মূলতত্ত্ব অগ্রে স্বতঃ-সিদ্ধ-রূপে না জানিলে আমরা কোন কিছুই পরীক্ষা করিতে পারিতাম না। অতএব উক্ত তত্ত্ব-সকল পরীক্ষা দ্বারা অর্জ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, উহারা থাকাতেই পরীক্ষা মুহূর্ত্ত কাল বর্ত্তিয়া থাকিতে পারিতেছে; সুতরাং উহারা সকল পরীক্ষারই মূলীভূত নিবন্ধন-স্বরূপ।

সংস্কৃত সাহিত্য।

২৭৪ সংখ্যক পত্রিকার ৩৮ পৃষ্ঠার পর।

যে সমস্ত আর্য্য জাতি ভূখারা প্রভৃতি স্থান হইতে উত্তরপশ্চিম প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আসিয়া ও ইউরোপের উত্তরপশ্চিম বিভাগের প্রধান জাতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহাঁরা ইতিবৃত্তরূপ রঙ্গস্থলের প্রধান অভিনেতা। যদ্দ্বারা আমাদিগের প্রকৃতি অলঙ্কৃত হইয়াছে, ইহাঁরাই সেই কার্য্যক্ষম জীবনের উপাদান পূর্ণভাবে বহন করিয়াছিলেন। এই জাতীয়েরা জনসমাজ প্রস্তুত করিয়া নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া যান। ইহাঁরাই সাহিত্য, শিল্পকার্য্য, শিল্পকৌশল, বিজ্ঞান ও পদার্থ বিদ্যার বীজ নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন; আমরা এক্ষণে তাহা হইতেই অনেকাংশে শিক্ষা লাভ করিতেছি। এই উত্তর-পশ্চিম-বাহিনী জাতির মধ্যে পরস্পর নানা সূত্রে মতান্তর উপস্থিত হইয়াছিল এবং ইহাঁরাই সেম বংশীয় ও তুরান জাতিদিগের সহিত নিরবচ্ছিন্ন বিবাদ কলহে প্রবৃত্ত হন। ইতিবৃত্ত পাঠে ইহা সুস্পষ্ট জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সভ্যতা, বাণিজ্য ও ধর্ম্ম-সূত্রে পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতিকে আবদ্ধ করাই ইহাঁদিগের একমাত্র কার্য্য ছিল। এই সমস্ত শ্রেয়স্কর কার্য্যে

ইহাঁদিগের জীবনের সমুদায় যত্ন ও পরিশ্রম অপ্রতিহতভাবে ব্যয়িত হইত। ফলত ইহাঁদিগের এই রূপ দেশহিতকর কার্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে বলিয়াই ইহাঁরা ইতিবৃত্তে বর্ণিত হইবার সম্যক্ উপযোগিতা লাভ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

যখন আর্য্য বংশীয়দিগের মধ্যে কতকগুলি ভুখারা হইতে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এই রূপ প্রশংসনীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তৎকালে তাঁহাদিগের আর একটি দল এই ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় আগমন করেন। ইহাঁরা প্রথমত হিমালয়ের সংকীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া অনায়াসে তত্রত্য আদিম জাতিদিগকে পরাজিত ও স্থানান্তরিত করিয়া দেন এবং পঞ্জাবের চন্দ্রভাগা বিতস্তা প্রভৃতি সাত নদীর অতি সুন্দর উর্ব্বর অন্তরাল ভুমিতে গৃহ প্রস্তুত করিয়া বাস করেন। সেই অবধি বহুকাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে আর নূতন উপনিবেশ সংস্থাপিত হয় নাই। যাঁহারা আসিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, যাঁহাদিগের শোণিতাক্ষরে লিখিত নাম সকল অদ্যাপি ইতিবৃত্তে পাঠ করা যায়, সেই সমস্ত সেসষ্ট্রিস সেমিরেমিশ ও নেবুকড্নেজার প্রভৃতি পূর্ব্বতন দিগ্বিজয়ীদিগের মধ্যে কেহই ইহাঁদিগের শান্তিভঙ্গে প্রবৃত্ত হন নাই। এই সমস্ত আর্য্য জাতি সর্ব্বাগ্রে আপনাদিগের অধিকৃত নূতন পৃথিবীতে বাস করিয়া কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। তৎকালে তাঁহারা কেবল গাঢ়তর চিন্তায় নিরন্তর আক্রান্ত ও অভিভুত হইয়া ছিলেন। ঐ সময় ভারতবর্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রাচীন বংশ সমুদায় উচ্ছিন্ন ও নূতন রাজ্য সকল প্রতিষ্ঠিত হয়। তথাচ ইহাঁদিগের মনের ভাব কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হয় নাই। পদ্মপলাশে জলসেক হইলে সে যেমন পূর্ব্ববৎই থাকে সেই রূপ ইহাঁদের চিত্ত কোনরূপেই বিচলিত হয় নাই। উহা পূর্ব্ববৎ সহিষ্ণু, চিন্তানিরত, শান্ত ও বিশ্বস্তই ছিল।

এই উর্ব্বর সর্ব্বজনমনোহর ভারতবর্ষে শান্ত প্রকৃতি অধিবাসীদিগের বিবাদের তিনটি কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ সমাজস্থ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরের প্রাধান্য লাভের চেষ্টা; দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষের দক্ষিণ ও অন্যান্য প্রদেশে অসভ্য জাতিদিগকে বশীভুত করিবার উদ্যোগ; তৃতীয়তঃ যাঁহারা সর্ব্বশেষে আসিয়া ভারতবর্ষের উত্তরে অধিবাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের দক্ষিণ দিগ্বিভাগস্থ ভুপতিগণের প্রতি আক্রমণের উপক্রম।

অতি পূর্ব্ব কালে ভারতবর্ষে তিনটি সমরানল প্রজ্বলিত হয়। এই রূপ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অনেকেরই উদ্যম উৎসাহ প্রভৃতি বৃত্তি সমুদায় উত্তেজিত হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতবর্ষীয়দিগের তাহা হয় নাই। গ্রিশ দেশেও এই কারণে যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তদ্দ্বারা গ্রিশিয়েরা যার পর নাই উন্নতি ও দক্ষতা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু ভারতবর্ষে সেই প্রকার যুদ্ধ হিন্দুদিগের মনে কেমন বিভিন্ন ফল উৎপন্ন করে! গ্রিশ দেশে বিভিন্ন শ্রেণি মধ্যে প্রাধান্যলাভচেষ্টা সংগ্রামানল উদ্দীপ্ত করিয়া নিকৃষ্ট শাসনপ্রণালীর উচ্ছেদ সাধন পূর্ব্বক পূর্ণাবয়ব প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু ভারতবর্ষে মহাবীর পরশুরামের বলবিক্রমে ক্ষত্রিয় কুল উন্মূলিত হইয়া একমাত্র ব্রাহ্মণদিগেরই জয়শ্রী হস্তগত হয়*।

* বিষ্ণু পুরাণে কথিত আছে মহাবীর পরশুরাম এক বিংশতি বার এই পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ক্ষত্রিয়শোণিতে সমন্তপঞ্চক নামে পাঁচটি অতিবিস্তীর্ণ হ্রদ প্রস্তুত করত তাহাতে আপনার পূর্ব্ব পুরুষ ভৃগুবংশীয়দিগের

ভারতবর্ষে অসভ্য দাক্ষিণাত্যদিগের বিপক্ষে দ্বিতীয় প্রকার যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, মহর্ষি বাল্মীকি তাহা দুরাত্মা অসুর ও রাক্ষসদিগের সহিত এক দৈবশক্তিসম্পন্ন বীরের যুদ্ধ রূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষে যেমন এই যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, গ্রিশ দেশেও পারসীকদিগের সহিত এই রূপ এক যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে এক মাত্র স্বদেশানুরাগ-প্রদীপ্ত সাহসের নিকট মহাবলপরাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পরাজয় প্রদর্শিত হইয়াছে। ইতিবৃত্তলেখক মহাত্মা হিরোডোটসের প্রণীত গ্রন্থ গ্রিশিয়দিগের রামায়ণ।

গ্রিশ ও ভারতবর্ষে তৃতীয় প্রকার যুদ্ধের ফলগত বৈষম্য অল্প বিস্ময়কর নহে। গ্রিশ দেশে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের মধ্যে জাতিগত একটি ঈর্ষার ভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই, যৎকালে একটি জাতি আর একটি জাতির ক্ষমতার উন্মূলন চেষ্টা করিতেছে,—যখন সকলেই দেশের সর্ব্বনাশের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে, তখন তত্রত্য ভিন্ন ভিন্ন জাতিদিগের কেমন সাহস, কেমন বক্তৃতা শক্তি, কেমন রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছিল। এদিকে ভারতবর্ষে কুরু-পাণ্ডবদিগের এক যুদ্ধ হইয়াছিল, বোধ হয় পিলপনিসিয় যুদ্ধ অপেক্ষা তাহাতে অল্প শোণিত ব্যয়িত হয় নাই; কিন্তু এমন ভীষণ বীরচরিত সমুদায় ব্রাহ্মণদিগের হস্তে কেমন উপদেশপূর্ণ আখ্যায়িকা রূপে পরিণত হইয়াছে।

গ্রিশ ও ভারতবর্ষে আর্য্যজাতির ঐতিহাসিক উৎকর্ষ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গ্রিশিয়েরা জীবদ্দশাকেই সত্য বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু হিন্দু জাতীয়েরা ইহাকে স্বপ্ন ও মোহ বলিয়া পরিগণিত করিয়া থাকেন। গ্রিশীয়দিগের যেখানে জন্ম সেই স্থানেই অবস্থান; স্বদেশ অধিকার করিয়াই তাঁহাদের সমুদায় পৌরুষ প্রদর্শিত হইত; তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়াই উন্নতি ও অবনতির অংশ গ্রহণ করিতেন এবং স্বদেশের স্বাধীনতা ও গৌরব রক্ষা করিবার নিমিত্ত আপনাদিগের জীবন বিসর্জন করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু হিন্দু জাতীয়েরা উদাসীনের ন্যায় একটি প্রদেশে প্রবেশ করেন; পরলোকের নিমিত্তই তাঁহাদিগের মনোবৃত্তি নিরন্তর ব্যাপৃত ছিল; এমন কি, কর্ম্মক্ষেত্রে যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাঁহারা তাহা কিছুই করিতেন না এবং এই জীবন হইতে মুক্তি লাভের জন্যই জীবন পরিত্যাগ করিতেন।

হিন্দু জাতীয়েরা ইতিবৃত্তে আপনাদিগের নামের গৌরব সম্পাদনের নিমিত্ত যে কিছু মাত্র যত্ন করেন নাই—সামাজিক ও রাজনীতির যে অল্পই অনুশীলন করিয়াছিলেন—সাংসারিক কার্য্যের ও সৌন্দর্য্যের ভাব যে তাঁহাদিগের অল্পই পরিজ্ঞাত ছিল, ইহা নিতান্ত বিস্ময়কর নহে। যাহাই হউক হিন্দুদিগের যে রূপ ভাব ছিল, গ্রিশিয়েরা তাহা কল্পনাপথেও উপনীত করিতে পারিতেন না এবং হিন্দুরাও গ্রিশিয়দিগের ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠানে অসমর্থ ছিলেন। তাঁহারা এই কর্ম্মক্ষেত্র প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের প্রতি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যে জগৎ চিন্তার বিষয় এবং যাহাতে বিশ্রাম লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহাতেই চক্ষু সম্পূর্ণ উন্মীলিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের জীবন অনন্ত কালের নিমিত্তই উৎসুক ছিল। ই-

তর্পণ করিয়াছিলেন। তৎপরে মহর্ষি কশ্যপকে এই সসাগরা পৃথিবী প্রদান করিয়া স্বয়ং মহেন্দ্র পর্ব্বতে গিয়া বাস করেন। তিনি অদ্যাপি সেই স্থলে জীবিত রহিয়াছেন। মহাভারতে এই রূপ উল্লিখিত আছে যে পৃথিবীর অনুরোধে পরশুরাম সমরানল উদ্দীপ্ত করিয়া ক্ষত্রিয়কুল উন্মূলিত করেন।

হাঁরা যাঁহা হইতে এই জীবন বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছে বিবেচনা করিতেন, সেই পরমাত্মাতে পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইবার নিমিত্তই যাহা কিছু কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। ইহাঁরা যথার্থ বিদ্যমান এক পুরুষের প্রতি বিশ্বাস করিয়া এই দৃশ্যমান জগতের অস্তিত্বে কদাপি বিশ্বাস করিতেন না। যদি একটি থাকে, তাহা হইলে দ্বিতীয়টির সম্ভাব কেবল ভ্রম মাত্র—যদি ইহাঁরা একের উপর বাস করেন, তাহা হইলে অপরের উপর বাস নিতান্ত অসম্ভব হয়; এই রূপ বোধ করিতেন। পৃথিবীতে অবস্থান ইহাঁদের পক্ষে সংশয়াত্মক কিন্তু অনন্ত জীবনই ইহাঁদের অভ্রান্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইত। আত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ পুনঃস্থাপন করাই ইহাঁদিগের ধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য—মায়াবলে অসত্যকে সত্য বলিয়া যে ভ্রান্তি উপস্থিত হইতেছে, সেই ভ্রান্তি দ্বারা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে অভেদ জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহাকে পুনরায় প্রকাশ করাই ইহাঁদিগের ধর্ম্মের এক মাত্র লক্ষ্য*। ইহাঁরা আত্মার অবিনশ্বর ভাবে সন্দেহ বা তন্নিবন্ধন তদ্বিষয়ে কখন প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই† কিন্তু শেষাবস্থায় তর্ক ও বিজ্ঞানের অনুরোধে কখন কখন তাহাতে সন্দেহ ও কখন কখন তাহা সপ্রমাণও করিতে গিয়াছেন"। কেবল ইহাঁদের ধর্ম্ম নয়, সাহিত্য নয়, কিন্তু ইহাঁদের ভাষাও ব্রহ্মলোক এবং এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান মর্ত্ত্যলোক এই উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ প্রতিদিন স্মরণ করাইয়া থাকে। আত্মা বা ত্মা এই শব্দ শারীরিক জীবন বলিয়া বেদে ব্যবহৃত আছে। ঋগ্বেদে সুররাজ ইন্দ্রের স্তুতিবাদে এক স্থলে কীর্ত্তিত হইয়াছে "হে ইন্দ্র! সমুদায় পৃথিবীতে সলিলের ন্যায় আমাদিগের আহরণীয় খাদ্য সামগ্রী পরিবর্দ্ধিত করিয়া দেও। হে শূর! বৃক্ষে যেমন রস সঞ্চরিত হইয়া থাকে, সেই রূপ ইহা দ্বারাই আমাদিগের দেহে আত্মার সঞ্চার হইতেছে†।" এই স্থলে আত্মা শব্দ জীবনকে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতেছে। আর এক স্থলে বলি প্রদানার্থোপনীত অশ্বকে সম্বোধন করিয়া এই রূপ অভিহিত হইয়াছে "মাত্বা তপতু প্রিয় আত্মা পিয়ং তং" এক্ষণে তুমি দেবগণের নিকট বলিপ্রদানার্থ উপনীত হইতেছ; অতএব তোমার প্রিয় আত্মা যেন তোমাকে পরিতপ্ত না করে। আরও আমরা স্থানে স্থানে দেখিতে পাই যে আত্মা শব্দ ইহা অপেক্ষাও বিস্তীর্ণ ভাব অভিব্যক্ত করিয়া দিতেছে। "সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ" সূর্য্য স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের আত্মা‡। যাহাই হউক আত্মা

* ঋগ্বেদে উল্লিখিত আছে "সতোবন্ধু মসতি নিরবিন্দন হৃদি প্রতীষ্য কবযো মনীষা।" কবিগণ অনেক চিন্তা করিয়া সৎ ও অসতের সংযোগ আবিষ্কৃত করিয়াছেন।

† বেদে মৃত্যুর পর জীবনের বিষয় অতি-অল্পই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পার্থিবসুখ বল দীর্ঘআয়ু পুত্র পশু ও আহার সামগ্রীর নিমিত্ত দেবগণের নিকট সততই প্রার্থনা করা হইয়াছে। মৃত্যুর পর দেবত্ব লাভ হওয়াই ধার্ম্মিকের এক মাত্র পুরস্কার। ঋগ্বেদে এক স্থলে কাক্ষীবান কহিয়াছেন, যিনি দাননিরত তিনি স্বর্গের উন্নত স্থান অধিকার করেন এবং দেবগণের মধ্যে পরিগণিত হন। আর এক স্থলে দীর্ঘতমা যাহারা ধনী হইয়াও দান করে না এবং যাহারা দেব পূজক নহে তাহাদিগকে নিন্দা করিয়া কহিয়াছেন, দেবলোকে যাঁহারা মহত্ব লাভ করিয়াছেন, যথার্থ ব্যক্তি তাঁহাদের অপেক্ষাও মহৎ। হে অগ্নি! আমরা নিরন্তর যেন তোমারই অর্চ্চনা করি।

* প্রেত্যভাব এই শব্দটি বেদান্তাদি দর্শন শাস্ত্রে প্রায়ই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা মৃত্যুর পর আত্মার অবস্থানকে প্রায়ই বুঝাইয়া থাকে। আমরা এই পৃথিবীতে এখন যেরূপ জীবিত রহিয়াছি, মৃত্যুর পর ঠিক এই রূপ যে অবস্থা উপস্থিত হইবে, তাহাকেই প্রেত্যভাব বলে। প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের মতে ভাব অর্থ বর্ত্তমান জীবন এবং প্রেত্য মৃত্যুর পর।

† ত্বং ত্যাং ন ইন্দ্র দেব চিত্রামিষমাপো ন পীপয়ঃ পরিজ্মন। যয়া শূর প্রত্যস্মভ্যং যংসি ত্মনমূর্জ্জং নং বিশ্বধ ক্ষরধ্যৈ। ১ ম ৬৩ সূক্ত ৮ ঋক।

‡ ঋগ্বেদে সূর্য্যকে জীব অসু শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "উদীর্ধ্বং জীবো অসুর্ন আগাদপ প্রাগাত্তম আজ্যোতি রেতি" হে জীবগণ! তোমরা শয়নস্থল পরিত্যাগ কর, আমাদিগের জীবাত্মা আগমন করিয়াছেন এবং অন্ধকারও অতিক্রান্ত হইয়াছে।

ও আত্মা শব্দ আমি এই কথায় সতত ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন আমার আত্মা প্রশংসা করিতেছে—আমার আত্মা আনন্দিত হইতেছে—অর্থাৎ আমি প্রশংসা করিতেছি ও আমি আনন্দিত হইতেছি। আধুনিক সংস্কৃত ভাষায় আত্মা শব্দের এই রূপই ব্যবহার হইয়া থাকে। আবার আত্মা শব্দে যাঁহা হইতে জগতের সমস্ত বস্তুর সদ্ভাব নিঃসৃত হইয়াছে, যাঁহাতে সমস্ত বস্তু প্রতিগমন করিবে এবং এই ক্ষুদ্র আত্মা যাঁহার অংশ, সেই জগতের আত্মা পরমাত্মাকেও নির্দ্দেশ করা যায়। এক জন হিন্দু আপনার আত্মার বিষয় বলিতে গিয়া অপরিজ্ঞাত ভাবে জগতের আত্মার বিষয়ও বলিয়া থাকেন এবং তাঁহার পক্ষে আপনার আত্মাকে জানাতেই আপনার আত্মা ও জগতের আত্মা এই উভয়কেই জানা হয়, অথবা জগতের আত্মাকে জানিলেই আপনার আত্মাকে জানা হয়।

থিওডোর পার্কর।

২৭৪ সংখ্যক পত্রিকার ৪১ পৃষ্ঠার পর।

জগতে যে সমস্ত ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে, অন্তর্নিহিত ধর্ম্মভাবই তৎসমুদায়ের মূল কারণ। যদি মনুষ্যকে কেবল বহির্বিষয় হইতেই ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হইত—যদি মনুষ্যের অন্তরে ধর্ম্মের ভাব না থাকিত, তাহা হইলে পশুপক্ষীর নৃত্য ও বাক্যপ্রয়োগ অভ্যাস করিবার ন্যায় ধর্ম্ম তাহার পক্ষে উদাসীন হইয়া থাকিত; তাহার ধর্ম্মজ্ঞতা ও ধর্ম্ম পরায়ণতা কিছু মাত্র দৃষ্টি গোচর হইত না, এবং তাহাকে স্বীয় প্রকৃতি ও পূর্ণ ভাব হইতে পরিভ্রষ্ট ও ধর্ম্মশূন্য পামর অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইতে হইত। আমাদিগের প্রকৃতিতে যদি নীতির বীজ না থাকিত, তাহা হইলে আমরা মনুষ্যের প্রতি কোন কর্ত্তব্যই সাধন করিতে সমর্থ হইতাম না—যদি আমাদের প্রকৃতিতে ধর্ম্মের বীজ না থাকিত, তাহা হইলে ঈশ্বরের প্রতি কোন কর্ত্তব্যের ভাবই আসিত না। কিন্তু যখন মনুষ্য ও ঈশ্বরের প্রতি একটি কর্ত্তব্যের ভাব আমাদিগের অন্তরে জাগ্রত রহিয়াছে, তখন নীতি ও ধর্ম্মের মূলপ্রকৃতি যে আমাদিগের আত্মাতে নিহিত আছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদি আমাদিগের আত্মাতে ধর্ম্মপ্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করা না যায়, তাহা হইলে অলৌকিক বা অন্য কোন রূপ প্রত্যাদেশই আমাদিগকে ধর্ম্মশীল করিতে পারে না। বাইবলের পত্র ও ধর্ম্মোপদেশের কণিকা দৈনিক খাদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া একটি মেষশাবককে ভক্ষণ করাইলে সে কি ধার্ম্মিক হইতে পারে? কখনই নহে। মনুষ্য এবং অন্যান্য জীবজন্তুর নিয়ম, কর্ত্তব্য ও নিয়তি ঈশ্বর স্বহস্তে উহাদের অভ্যন্তরে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং ধর্ম্মের উপাদান আমাদিগের অন্তরেই নিহিত আছে এবং ইহাই ধর্ম্মকে মানবজাতির কর্ত্তব্য, অধিকার ও মঙ্গলের নিদান রূপে পরিণত করিতেছে। সুতরাং ধর্ম্ম যে মনুষ্য জাতির একটি অযৌক্তিক পদার্থ তাহা নহে; অথবা মনুষ্য সম্বন্ধে যা কিছু আবশ্যক, সমুদায় সমাহিত হইলে, পরিশেষে ঈশ্বর সবিশেষ অনুধাবন করিয়া কৌশলে ইহা যে মনুষ্যের কার্য্যমধ্যে মিশ্রিত করিয়া দিয়াছেন, তাহাও নহে। ধর্ম্মভাব একটি মানব-প্রকৃতির আদিম অভাব। ইহা অতি গভীর এবং মনুষ্যের ভিত্তিমূলে রোপিত আছে।

ধর্ম্মের উপাদান সাধারণকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহা যে, সকল ব্যক্তিতে সমান রূপে আছে, তাহা নানা প্রকারে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ সকল জা-

ক্তিতে সকল কালে ও সকল দেশেই মনুষ্যের প্রকৃতি একই রূপ। একটি মনুষ্যের মূলপ্রকৃতিতে যা কিছু আছে, বিভিন্ন পরিমাণে হউক, কিন্তু তাহাই প্রত্যেক মনুষ্যে বিদ্যমান থাকিবে। কেবল জল বায়ুর তারতম্য, বিভিন্ন অবস্থা, শিক্ষা এবং জাতি, বংশ ও ব্যক্তিবিশেষে তাহার কার্য্যগত রূপান্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। জাতি, বংশ ও ব্যক্তিগত প্রভেদ বিশেষ বিশেষ বৃত্তির বিভিন্ন পরিমাণে অধিকার, এবং তৎসমুদায়ের উন্নতি সাধন বা তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্যের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সুতরাং যখন ইহা প্রদর্শিত হইল যে, ধর্ম্মভাব এক জন মনুষ্যের মূলপ্রকৃতিরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন যে সমস্ত মনুষ্য উৎপন্ন হইতেছে, হইবে ও হইয়াছে, তাহাদিগের সকলেরই প্রকৃতির একরূপতা নিবন্ধন উহা একরূপই হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্মভাব যে মনুষ্যসাধারণ, তাহা ইতিবৃত্তমূলক যুক্তি দ্বারাও সমর্থন করা যাইতে পারে। যে স্থলে মনুষ্যের বসতি আছে, সেই খানেই ধর্ম্মের মূর্ত্তি নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। মনুষ্যের কি অসভ্যাবস্থা কি সভ্যাবস্থা সকল অবস্থাতেই তাহা তুল্য রূপে দৃষ্ট হয়। কি নব-জিলণ্ডের নরমাংস-লোলুপ রাক্ষস, কি বাবিলনের ভোগাভিলাষী বিলাসী, কি গ্রিনলাণ্ডের জাল্লিক, কি পারস্যের দর্শনবিৎ সকল মনুষ্যই কোন না কোন ধর্ম্মের রমণীয় মূর্ত্তি লোকসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। ফলত মানবজাতির ইতিবৃত্ত ইহা সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন করিতেছে যে এই জীবলোকে এমন সময়ই ছিল না যে সময়ে, ধর্ম্মের মূর্ত্তি কোন না কোন রূপে প্রদর্শিত হয় নাই। মনুষ্য মনের সহিত ঈশ্বরকে পূজা করিয়া থাকে। সে আপনাকে কাহারও অধীন বলিয়া অনুভব করে, সে আত্মকৃত কার্য্যে আপনিই দায়ী তাহা বিলক্ষণ স্বীকার করে এবং বাহ্য জগতে আপনার অন্তর্গত ধর্ম্মভাবের চিহ্নও প্রদর্শন করিয়া থাকে। মনুষ্য যার পর নাই অসভ্য হইলেও এই বিষয়ে কদাচ উদাসীন নহে এবং সভ্যতার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিলেও ইহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং দূরদৃষ্টি এবং মানবপ্রকৃতি হইতে যুক্তিসিদ্ধ অভ্রান্ত অনুমান এই উভয়ই ধর্ম্মভাব যে জাতি সাধারণ ইহা সবিশেষ প্রতিপাদন করিতেছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

এই সিদ্ধান্তে আপাতত বিপ্রতিপত্তি দোষ লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু তাহা যে নিতান্ত অমূলক, তাহা স্থির চিত্তে এক বার অনুধ্যান করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। কোন কোন সময়ে কোন কোন ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া নাস্তিক নামে পরিগণিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা আপনাদের ধর্ম্মভাব এবং নির্ভরের ভাব সুস্পষ্টই স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু এই ধর্ম্মভাব ও নির্ভরের ভাব আপনাদের প্রকৃতিতে আরোপ না করিয়া এই রূপ কহেন, যে, ইহা আত্মার বিকার, শিক্ষার প্রভাব ও ধাত্রীদিগের প্রবর্ত্তনা হইতে উৎপন্ন হয়। তাঁহারা আরও কহিয়া থাকেন যে মনুষ্যে যে এই রূপ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা চিত্তের দুরপনেয় ব্যাধি, এবং বাল্যাবধি বদ্ধমূল কুসংস্কার বৈ আর কিছুই নহে। কেহ কেহ বা মনুষ্যের ধর্ম্মভাবে সন্দিহান হইয়া এক কালে তাহার অস্তিত্ব অস্বীকারই করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা দ্বারাও জাতিসাধারণ ধর্ম্মভাবের কিছু মাত্র ব্যাঘাত উপস্থিত হইতেছে না। যদি একটি শিশু দৈবাৎ একহস্তবিশিষ্ট হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে তদ্দর্শনে সাধারণ

মনুষ্যেরই যে এক হাত, ইহা কখনই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না।

কোন কোন পর্য্যটক কহিয়া থাকেন যে, কোন কোন জাতির ঈশ্বর নাই ধর্ম্ম-যাজক নাই এবং উপাসনাদিও নাই, সুতরাং তাহাদিগের অন্তরে যে ধর্ম্মভাব বিদ্যমান আছে, তাহার কোন নিদর্শনই দৃষ্ট হইতেছে না। কোন কোন অসভ্য জাতির বাহ্যে যে ধর্ম্মের কোন চিহ্নই দৃষ্ট হয় না ইহা যথার্থ বটে, কিন্তু এই বলিয়াই যে তাহাদের অন্তরে ধর্ম্মভাবের অভাব আছে, তাহা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। এ স্থলে এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে বালকের ন্যায় উহাদের ধর্ম্মপ্রকৃতি নিতান্ত প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে; উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইলেই উহাদিগের ধর্ম্মের কার্য্য প্রদর্শিত হইতে পারে। কিন্তু যে সমস্ত পর্য্যটক ধর্ম্ম-কার্য্যের নিদর্শন দেখিতে না পাইয়া, কোন কোন অসভ্য জাতির ধর্ম্ম ভাবের এককালে অসদ্ভাব স্বীকার করেন, তাঁহারা বিষম ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। তাঁহারা ঐ সমস্ত অসভ্য জাতির আচার ব্যবহার যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা বাহ্য, কিছুই আভ্যন্তরিক নহে, এবং তাঁহাদিগের চক্ষু কুসংস্কারে এক প্রকার অন্ধ হইয়া আছে। তাঁহারা জনসমাজে নিয়মিত উপাসনা, ধর্ম্মযাজক, দেবমন্দির, দেবপ্রতিমা এবং ধর্ম্মসংক্রান্ত নানাপ্রকার অনুষ্ঠান দর্শন করিয়া থাকেন; কিন্তু ধর্ম্মোন্নতি সাধনের এমন এক রঙ্গভূমি আছে, যথায় এই সমস্ত ধর্ম্মসংক্রান্ত বাহ্য কার্য্যের কিছুই নাই, অথচ তথায় ধর্ম্মভাব পূর্ণভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। যাহাই হউক, ঐ সমস্ত পর্য্যটকেরা উপাসনার কোন নির্দ্দিষ্ট নিদর্শন না দেখিয়া উপাসনার স্থায়িত্ব এবং জাতিগত ধর্ম্মভাবের স্থায়িত্ব স্পষ্ট অস্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু যদি এক ব্যক্তি সূপশাস্ত্রে নিতান্ত অনভিজ্ঞ এবং দ্রব্যসংস্কারের উপকরণ শূন্য হয়, তাহা হইলে তাঁহারা এই ব্যক্তিরেক দৃষ্টান্ত দর্শনে কি এই রূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন যে, মানবজাতি পানাহার করে না। পূর্ব্ব কালে পৌত্তলিক ও খ্রিষ্টিয়ানেরা যে পরস্পর পরস্পরকে নাস্তিক বলিয়া বিশ্বাস করিত, ইহাই তাহার কারণ সন্দেহ নাই।

বাহ্যে ধর্ম্মসংক্রান্ত কার্য্যের চিহ্ন না থাকিলেও অন্তরে যে ধর্ম্মভাব বিদ্যমান থাকে আপাতত কোনস্থলে এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। মনে কর, এক ব্যক্তি শৈশবাবধি জনসমাজ হইতে কোন এক নিভৃত প্রদেশে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে স্বজাতীয় কাহারই সহিত তাহার ক্ষণকালের নিমিত্তও সাক্ষাৎ হয় নাই। এই অবস্থায় সেই ব্যক্তি স্বীয় নৈসর্গিক ধর্ম্মভাবের কোন চিহ্নই বাহ্যে প্রদর্শন করিতে পারে না; কেবল ধর্ম্মভাব নয়, তৎকালে তাহার হাস্য এবং সুস্পষ্ট বাক্য প্রয়োগের ইচ্ছা প্রভৃতি অন্যান্য জাতিসাধারণবৃত্তিও যার পর নাই দুর্ব্বল হইয়া থাকে। কিন্তু যখন ঐ মন্দভাগ্যকে পুনরায় জনসমাজে আনয়ন করা হয়, তখন উহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় ক্রমশ উন্মেষিত হইতে থাকে। এই কারণেই আমরা এই রূপ সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি স্বীয় উন্নতির প্রকৃত অবস্থা প্রাপ্ত না হইলেই গূঢ়ভাবে অবস্থান করে, কিন্তু কোন অবস্থায় ইহার একান্ত অসদ্ভাব কদাচ দৃষ্টি-গোচর হয় না। এক্ষণে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে এই তিনটি প্রতিকূল দৃষ্টান্তও মনুষ্যের অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যে জাতিসাধারণ তাহা প্রতিপাদন ও সবিশেষ সমর্থন করিতেছে, তাহার আর কোন সংশয় নাই।

জাতি বিশেষ, বংশবিশেষ ও ব্যক্তি-বিশেষ এই ধর্ম্মভাব অন্যান্য মানসিক বৃত্তির ন্যায় বিভিন্ন পরিমাণে অধিকার করিয়া থাকে এবং পৃথিবীর কোন বিশেষ কালে ইহার প্রভাব অপেক্ষাকৃত সমধিক দৃষ্টিগোচর হয়। জগৎ স্রষ্টা জগদীশ্বর দুইটি জাতি, দুইটি বংশ ও দুইটি মনুষ্যকে তুল্যগুণসম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। উভয় জাতি, উভয় বংশ এবং এক জাতীয় ও এক বংশীয় উভয় ব্যক্তিরও আকারগত বৈলক্ষণ্যের ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগত এত অন্তর আছে যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। উহাদের কেবল অবস্থা ভেদে যে এই ভেদটি উপস্থিত হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু উহাদের মূলপ্রকৃতি একবিধ হইলেও উহারা তাহার পরিমাণগত বৈলক্ষণ্য লইয়া যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহা হইতেই এই ভেদটি উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা ইতিবৃত্ত মধ্যে মানবজাতির উন্নতির বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিতে পাই যে, এক জাতি মনো-বৃত্তির অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়া বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্প শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছে; এক জাতি যুদ্ধের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ও রাজনীতির উন্নতি করিতেছে; আর এক জাতি বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, যুদ্ধ ও রাজনীতির উন্নতি সাধনে উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক কেবল ধর্ম্মকে পরিবর্দ্ধিত করিতেছে এবং ইহাদের ধর্ম্মভাবের বিশুদ্ধতাও অপেক্ষাকৃত সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

পৃথিবীর ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, একেশ্বর-প্রতিপাদক ধর্ম্ম কালসহকারে তিন প্রকার হইয়া আসিয়াছে। তন্মধ্যে এক্ষণে দুইটির উপাসক অন্যান্য ধর্ম্মের উপাসক সংখ্যা অপেক্ষা সমধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং ঐ দুই ধর্ম্মই এক্ষণে এই পৃথিবীতে অপেক্ষাকৃত সভ্যতা বিস্তার করিতেছে। উক্ত ত্রিবিধ ধর্ম্ম হইতে ইহুদী, খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান এই তিন সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাঁদের মধ্যে সকলেই মনুষ্যের ধর্ম্মপ্রকৃতিতে বিশ্বাস করেন—সকলেই ঈশ্বরকে অদ্বিতীয় এবং সকলেই ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ বিষয়ে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রকার ভেদে এক রূপ ভাষা ব্যবহার ও এক দেশে বাস করিতেন এবং যাঁহাদিগের আচার ব্যবহার ও শাসন প্রণালী একই রূপ ছিল, এই রূপ মনুষ্যগণের পরিবার হইতে এই তিন সম্প্রদায়ই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই তিন সম্প্রদায় এক পরিবার হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ইউরোপের বন্য জাতিদিগের সুবিস্তীর্ণ অতি অদ্ভুত ধর্ম্ম একেশ্বর-প্রতিপাদক ধর্ম্মের অনেকাংশে সাদৃশ্য প্রদর্শন করিতেছে। যে ধর্ম্ম গ্রিশ দেশকে দেবমন্দির প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিল, যাহা ভূমধ্য সাগরের দ্বীপপুঞ্জকে অতিগভীর সঙ্গীত দ্বারা প্রতিধ্বনিত করিত, সেই ধর্ম্মও এই ধর্ম্ম হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। যে ধর্ম্ম স্বর্গ হইতে জীবলোকে অবতীর্ণ হইয়াছে, গ্রিশিয়েরা সেই একেশ্বর-প্রতিপাক ধর্ম্মকেই রূপান্তরিত, পরিবর্দ্ধিত ও বিভূষিত করিয়া লইয়াছিলেন। যে জাতীয়েরা এক্ষণে সভ্যতম বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন, তাঁহারা যে এক অভিনব ধর্ম্ম প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসম্ভব। এক্ষণে ইহাঁদিগের যত প্রকার উপাসনা পদ্ধতি দৃষ্টিগোচর হয়, ইহাঁরা তৎসমুদায় অন্যান্য জাতি হইতে অধিকার করিয়াছেন, এবং এক জাতি হইতে অন্য জাতিতে সংক্রান্ত

হইয়াছে বলিয়া ইহাঁদের ধর্ম্ম হইতে প্রকৃত ধর্ম্মের অনেক অংশ বিলুপ্তও হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত জাতি ধর্ম্ম অপেক্ষা বিজ্ঞানেরই সবিশেষ সমাদর করেন—মনের সহজ গতি দ্বারা যাহা উপলব্ধ হয়, তদপেক্ষা বুদ্ধিশক্তিবিহিত বিষয়েই সমধিক অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন; ইহাঁদের সাংসারিক কার্য্যফলের প্রতিই অধিক লক্ষ্য কিন্তু ভক্তি শ্রদ্ধার প্রতি তাদৃশ নহে। আমরা ইতিবৃত্ত অনুশীলন করিয়া ইহা সুস্পষ্টই দেখিতে পাই যে, এই জাতীয়েরা কোন রূপ নূতনবিধ ধর্ম্মের সৃষ্টি করেন নাই। ইহাঁদের বিশ্বাসটি অন্য জাতি হইতে সমানীত এবং বিদেশজাত বৃক্ষের ন্যায় স্থানান্তরে রোপিত হইলেও বহুফলপ্রদ হইয়াছে। আমরা যত গুলি জানি তন্মধ্যে এই সমস্ত জাতি সবিশেষ বুদ্ধিমান্ এবং কাব্য, বিজ্ঞান ও শিল্প শাস্ত্রে পারদর্শী। কিন্তু সেমবংশীয়েরা অন্যবিধ, উহাঁরা অন্যান্য ধর্ম্মপরায়ণ জাতি মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা ইহাঁদিগের বিদ্যা বুদ্ধি ও সংখ্যা অল্প। ইহাঁদিগের হইতেই পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটি সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছে। এ ক্ষণে ঐ তিন সম্প্রদায় হইতেই পৃথিবীর ধর্ম্ম-রাজ্যের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। গ্রিশীয় ও ইজিপ্টীয়েরা মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া দিয়াছিল এবং উহাদিগের দ্বারাই আমাদিগের সুপ্রশস্ত সুন্দর অন্তর্নিহিত বৃত্তি সমুদায়ের প্রিয়তা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে; কিন্তু এই সেমবংশীয়েরা আপনাদিগের ধর্ম্মভাবে মনুষ্যের আত্মাকে স্পর্শ করিয়াছে এবং পবিত্রস্বরূপ মঙ্গলসঙ্কল্প পরম সুন্দর এবং প্রতি আত্মার অতি গভীরতম প্রদেশে বিরাজিত রাজাধিরাজ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিকে উত্তেজিত করিয়া দিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া প্রদেশ বাসী কএকটি জাতির ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অতি অস্পষ্টই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেবল তাহাদিগের নহে, সামান্যত অসভ্য জাতিদিগেরই অন্যান্য উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির ন্যায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তিও নিতান্ত অপরিণত অবস্থায় রহিয়াছে। কিন্তু মনুষ্য যে পরিমাণে আপনার প্রকৃতিকে উন্নত করে, সেই পরিমাণে তাহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তিও উন্নত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

পৃথিবী ও মনুষ্য।

২৭২ সংখ্যক পত্রিকার ২৫৬ পৃষ্ঠার পর।
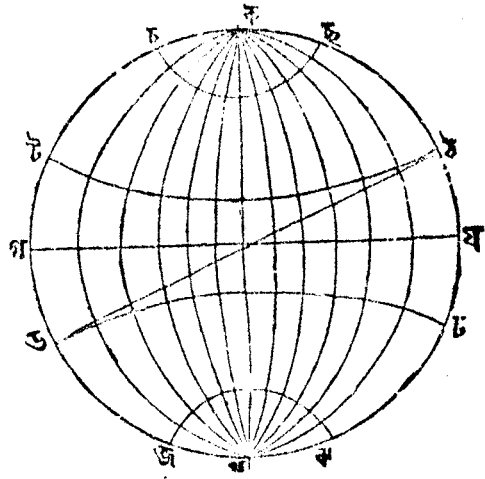
আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে ক্রমপ্রবণ ভূমির বিষয় বিবৃত করিয়াছি, এক্ষণে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকার মালভূমি, সমতল প্রদেশ ও পর্ব্বতের বিষয় উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পৃথিবীর এই তিন প্রকার আকার বিদ্যমান থাকাতেই জল বায়ু উদ্ভিজ্জ এবং মনুষ্যের স্থিতি ও বৃদ্ধি কএক বিষয়ের সবিশেষ উন্নতি হইতেছে। সুতরাং এই তিন প্রকার ভূমি কোন্ প্রদেশে কি রূপ আছে, সর্ব্বাগ্রে তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত নিরর্থক বোধ হয় না।

প্রাচীন পৃথিবীতে মালভূমি ও পর্ব্বতের ভাগই অধিক। এমন কি, আসিয়া ও আফ্রিকার ন্যায় কোন প্রদেশেই উন্নত

ও বিস্তীর্ণ বহুসংখ্য ভূমি দৃষ্টিগোচর হয় না। আসিয়ার মধ্য বিভাগে চারিটি বিস্তীর্ণ পর্ব্বতশ্রেণী আছে। এই চারিটি পর্ব্বত থাকাতেই তথায় মালভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ সমস্ত ভূমি ৫০০০ পাদ হইতে ১৬০০০ পাদ পর্য্যন্ত উচ্চ এবং ইহা অন্যূন ২৪০০ মাইল বিস্তীর্ণ এবং ১৫০০ মাইল প্রশস্ত। আসিয়ার পশ্চিম দিকে প্রায় সমস্তই মালভূমি। তৎ সমুদায় প্রায় ৩০০০ হইতে ৬০০০ পাদ পর্য্যন্ত উচ্চ। এ দিকে আবার আফ্রিকায় সাহারার দক্ষিণে কেবলই উচ্চ ভূমি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহা নির্ণীত হইয়াছে যে পর্ব্বত ও মালভূমি আসিয়ার বিস্তার ভাগের সাত অংশের পাঁচ অংশ এবং সমতল ক্ষেত্র সাত অংশের দুই অংশ মাত্র অধিকার করিতেছে। কিন্তু আফ্রিকার মালভূমি ঐ প্রদেশের বিস্তার ভাগের তিন অংশের দুই অংশ এবং সমতল ক্ষেত্র তিন অংশের একাংশ মাত্র অধিকার করিতেছে। এই প্রাচীন পৃথিবীতে সমতল ভূমিরও অভাব নাই। ইউরোপ ও আসিয়ার উত্তরে অতি বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র দৃষ্টিগোচর হয়। এমন কি হলাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া জর্ম্মণি রুসিয়া কাস্পিয়ান সাগরের সন্নিহিত প্রদেশ সমুদায় এবং সাইবিরিয়া পর্য্যন্ত অন্যূন ছয় হাজার মাইল পরিসর প্রায় সমতল ক্ষেত্র। আফ্রিকাতে সাহারা প্রদেশে সকলই সমতল ভূমি। উহার বিস্তার ২৫০০০ মাইল এবং প্রস্থ ১০০০ মাইল। প্রাচীন পৃথিবীর সমতল ক্ষেত্র শীতমণ্ডল হইতে উষ্ণমণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। এক দিকে দুরন্ত শীত ও আর এক দিকে প্রবল উত্তাপ, এই উভয়ের সহযোগিতায় এই সুবিস্তীর্ণ স্থানটি পূর্ণমঙ্গল সঙ্কল্প জগৎ প্রসবিতা অতিশয় উপযোগী করিয়াছেন।

নূতন পৃথিবীতে অধিকাংশই সমতল ক্ষেত্র। এমন কি, উহা নূতন পৃথিবীর তিন ভাগের দুই ভাগ, আর মালভূমি ও পর্ব্বত তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আমেরিকার পশ্চিম পার্শ্বে কেবল উচ্চ ভূমি দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাও প্রস্থে অতি অল্প, কিন্তু উহার পূর্ব্ব ভাগে সমতল ক্ষেত্রও আছে। এই ক্ষেত্র উত্তর কেন্দ্র হইতে দক্ষিণ কেন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। হিমসাগর হইতে মেক্‌সিকোর উপসাগর পর্য্যন্ত যে স্থান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রায় ২৪০০ মাইল বিস্তীর্ণ। এই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে অতি অল্পই উচ্চ ভূমি আছে। অরিওনোকো নদীর তট হইতে লাপ্লাটা পর্ব্বত পর্য্যন্ত তিন হাজার মাইল নিম্ন ভূমি আছে, ইহার মধ্যে কেবল পশ্চিম ব্রাজিলে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। এই উচ্চ ভূমি আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্ত পাটাগোনিয়া পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। মারানন নদী যে স্থান দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তাহার পরিসর ১৬০০ মাইল। স্বাস্থ্যকর জলবায়ু, উর্ব্বর ভূমি, আশ্চর্য্য তরু গুল্ম, এই স্থানেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই স্থান হইতেই দেশের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে এবং আমেরিকা যে ভবিষ্যতে অসম্ভাবিত উন্নতি পদবীতে আরোহণ করিবে, এই স্থান হইতেই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ উপলব্ধ হইতেছে।

নূতন ও প্রাচীন পৃথিবী এই রূপে পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতেছে। ইউরোপের পশ্চিমে রুসিয়া ভিন্ন অন্য স্থানে যে সমস্ত পর্ব্বত আছে, তাহার সন্নিকটে উচ্চ ভূমি নাই। পশ্চিম ইউরোপের এইটি বিশেষ লক্ষণ।

আত্মোৎকর্ষ বিধান।

২৭২ সংখ্যক পত্রিকার ২৫৪ পৃষ্ঠার পর।

রাজনীতিকে আত্মোৎকর্ষ বিধানের উপায় বলিয়া বিবেচনা করিবার প্রসঙ্গে সংবাদ পত্র সকলের উল্লেখ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না; কেননা এই সমস্তই পঠনাভিজ্ঞ প্রজাগণমধ্যে অধিকাংশের প্রধান পাঠ্য হইয়া থাকে। সংবাদ পত্র সাধারণ সকল প্রজাপুঞ্জের সাহিত্য শাস্ত্র; পরন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তৎ সমুদায়ের উপযোগিতা ও গৌরব এ পর্য্যন্ত কাহারও বিশিষ্টরূপ হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না;—সমাজের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ক উৎকর্ষ সাধনে উহাদিগের যে সহকারিতা আছে, তাহা প্রায়ই বিবেচিত হইতেছে না। সংবাদ পত্রের সম্পাদক হওয়া সামান্য লোকের কর্ম্ম নহে। স্বার্থপরায়ণ অদূরদর্শী অনুদার মনুষ্যেরা সংবাদ পত্র সম্পাদনের পাত্র হইতে পারে না; উহা অসামান্য-ধীভাগ্য-সম্পন্ন উন্নতমনা মানবগণের কার্য্য। যোগ্য লোকে উহাতে হস্ত ক্ষেপ করিবেন, এবং তাঁহার আয় এরূপ হইবে যে তদ্দ্বারা তিনি আপনার সদৃশ বিচক্ষণ বিবুধগণের বিদ্যাখনি হইতেও অমূল্য জ্ঞানরত্ন সকল অবাধে সংকলন করিতে পারিবেন, তাহা হইলেই সংবাদ পত্র রত্নহার হইবে;—তাহা হইলেই উহার যথার্থ প্রতিভা প্রকাশ পাইবে। এ ক্ষণে সংবাদ পত্র সকলের যেরূপ অবস্থা চলিতেছে, তদনুসারেই আমাদিগকে উহাদের গুণাগুণ নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে। যাঁহার আত্মোৎকর্ষ বিধানে সমধিক ঔৎসুক্য আছে, তিনি এক্ষণকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংবাদ পত্র সংগ্রহ করিতে পারিলে অভিপ্রেত সিদ্ধি বিষয়ে বিস্তর আনুকূল্য প্রাপ্ত হইবেন। যে সকলেতে দ্বেষ, হিংসা, গ্লানি, প্রভৃতি বিষবৎ বিষয় সমূহের বিবরণ অথবা কুৎসিত পরিহাসরসের প্রাচুর্য্য থাকে, তৎসমুদায়কে মারাত্মক সংক্রামক রোগের ন্যায় জ্ঞান করিয়া তাঁহার গৃহ হইতে নিষ্কাসিত করা বিধেয়। সংবাদ পত্র মনোনীত করিবার সময়ে উহার সম্পাদকের অভিজ্ঞতা ও রচনা-নৈপুণ্যের প্রতি তাঁহাকে যত না দৃষ্টি রাখিতে হইবে, উহার ঔদার্য্য, বীর্য্য, ভাবগাম্ভীর্য্য এবং ন্যায়, সত্য ও সারল্য প্রভৃতি প্রকৃত সৌন্দর্য্যের প্রতি তাঁহার চতুর্গুণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সংবাদ পত্রের দলাদলি স্থলে তিনি যদি সত্যজিজ্ঞাসু হন, তবে উভয় পক্ষেই কর্ণপাত করিবেন। একের আক্রমণ ও অন্যের আত্মসংরক্ষণ উভয়ই তাঁহাকে পাঠ করিতে হইবে, কেবল এক পক্ষের জল্পনায় নিরবচ্ছিন্ন চিত্তনিবেশ করিলে চলিবে না। আধুনিক জগতে আত্মপ্রশংসা ও পরগ্লানি প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তি সকলেরই অধিক প্রাদুর্ভাব; অতএব কেহ কাহারো কুৎসা বা দোষ কীর্ত্তন করিলে আমরা বিচার বিনির্ম্মুখে তাহার বাক্যেই প্রত্যয় করিয়া যদি অন্যের আত্মশোধন প্রস্তাব শ্রবণে পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে আমাদিগকে অবশ্যই পক্ষপাত দোষে দূষিত হইতে হইবে।

সৌভাগ্য ক্রমে অধুনা সংবাদ পত্র সকলের বিস্তর বিশুদ্ধি হইয়াছে। পাঠক বর্গের চিত্তরঞ্জনার্থে শ্রাদ্ধ ও বিবাহাদির সমারোহ বর্ণন, অদ্ভুত জনশ্রুতি সকলের উদ্ঘোষণ, জাতিবিচার ব্যভিচার পানাসক্তি দলাদলি প্রভৃতির অনুকূল আন্দোলন, দুষ্প্রবৃত্তি পরিপোষক অশ্লীল কাব্যকলাপের প্রকটন এবং চিরপ্রসিদ্ধ ঔষধাবলির বারংবার নিরর্থক গুণ কথন প্রভৃতি অসার পদার্থনিকরে উহাদের উদর পূরণ

প্রায়ই নয়নগোচর হইতেছে না। এক্ষণে সামাজিক রীতি নীতির পরিশোধন, জাতি সাধারণ শুভাবহ বহুবিধ স্পৃহনীয় প্রস্তাব সমূহের আন্দোলন, বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোন্নতি ও ধর্ম্ম সমৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণ, পুরাকালীন জ্ঞান ধর্ম্মাদির পরিচায়ক পুরাণাদি প্রবন্ধ সমুদায়ের সংকলন, অভিনব পুস্তক সমস্তের সমালোচন, দণ্ডনীতি ও রাজকীয় ব্যবস্থা পদ্ধতির পর্য্যবেক্ষণ, রাজপুরুষদিগের কার্য্য সংক্রান্ত উৎকর্ষাপকর্ষ ও ঔচিত্যানৌচিত্যের সমবধারণ প্রভৃতি সুরুচির উপাদেয় বিষয় সমস্তই উহাদের উপজীব্য হইতেছে। এতাদৃশ হৃদ্যতর সুপথ্যের উপযোগে সংবাদ পত্র সকলের অনাময় ও চিরজীবন সম্ভোগ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। মঙ্গলসংকল্প বিশ্ববিধাতার মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় উহারা চির কাল বিশ্বজনীন কল্যাণ-নিবহের উদ্ভাবন এবং তদ্দ্বারা মানবপ্রকৃতির ক্রমশ উৎকর্ষ সম্পাদন করিতে থাকে, ইহাই একান্ত প্রার্থনীয়।

নূতন পুস্তক।

১। সর্ব্বার্থ সংগ্রহ। আমরা ইহার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া দেখিলাম, ইহাতে যে সমস্ত বিষয় আছে, তৎসমুদায় দ্বারা সাহিত্য-সংসারের সবিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।

২। আসিয়াটিক সোসাইটির জর্নাল। আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে ইহার তিন খণ্ড আনুপূর্ব্বিক উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

৩। মিউজিক অব দি এন্‌সিএনটস্‌। আর্থর হুইটেন কলিকাতা নরম্যাল স্কুলে পূর্ব্বতন লোকদিগের সঙ্গীত বিদ্যার বিষয়ে ইংরাজিতে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া পুস্তকাকারে প্রচারিত করিয়াছেন। আমরা তাহার এক খণ্ড উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। অবসর ক্রমে এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উপর আমাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিব।

উদ্ধৃত

ব্রহ্মসাধন।

ব্রহ্মসাধনের প্রথম সোপান।—মৃত্যুকে সর্ব্বদা স্মরণ করা।

এই মৃত্যু স্মরণ না করাতেই আমাদের যত অনর্থ ঘটিতেছে। মৃত্যু আমাদিগকে সর্ব্বদাই শিক্ষা দিতেছে যে তোমরা অতি অল্প দিনের নিমিত্তই এখানে আছ, কখন্ তোমাদিগকে পরকালে যাইতে হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। আমরাও তাহা কতবার শ্রবণ করিতেছি; কিন্তু কার্য্যের সময়ে সে সকলই ভুলিয়া গিয়া আমরা আমাদের সমস্ত আশা ভরসা এই সংসারেই বদ্ধ করিয়া রাখি। তখন সংসার আমাদের সর্ব্বস্ব জ্ঞান হয়; পরকাল ও ঈশ্বরের প্রতি তখন আমরা উদাসীন হইয়া পড়ি। কিন্তু আমাদিগের প্রত্যেকের পক্ষে ইহা মনে করা কর্ত্তব্য যে, আমাদিগের মধ্যে যাহার যত বয়ঃক্রম হইয়াছে, তাহার আয়ু হইতে তত বৎসর অপহৃত হইয়াছে। কি জানি অদ্য রাত্রিতে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলে "তোমাকে এখনই যাইতে হইবে।" এখনই যাইতে হইবে! কি ভয়ঙ্কর বাক্য! এই অপ্রস্তুত অসংশোধিত অনুন্নত আত্মার সহিত পরকাল রূপ অনন্ত সমুদ্রে ভাসমান হইতে হইবে! কি ভয়ানক কথা!! যদি এই ভাব আমাদিগের অন্তঃকরণে জাগরূক থাকে, তাহা হইলে পরকালের জন্য প্রস্তুত হইতে মন সর্ব্বদা ব্যগ্র হয়। তখন আমরা এখানে আপনাদিগকে পান্থনিবাসির ন্যায় প্রতীতি করি এবং যাহা লইয়া পরকালে যাইব, তাহারই উন্নতি সাধন করিতে সচেষ্ট হই।

ব্রহ্মসাধনের দ্বিতীয় সোপান।—বৈরাগ্য।

সংসারের সকল বস্তু অস্থায়ী ও অসার; যে পর্য্যন্ত না এই সত্য মনে উজ্জ্বলরূপে প্রতীত হইয়া বৈরাগ্যের উদয় হয়, যে পর্য্যন্ত না সংসারের সকল বস্তুর প্রতি অত্যন্ত আশক্তি পরিত্যক্ত হয়, সে পর্য্যন্ত কখন আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রতি অভিরুচির উদয় হয় না। অতএব আমাদিগকে

বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে হইবে। সাংসারিক বস্তুর অস্থায়িত্ব অসারত্ব আমরা যত প্রতীতি করিব, তাহাদের প্রতি আসক্তি তত ক্ষীণ হইতে থাকিবে, ইন্দ্রিয়গণের প্রবলতা তত খর্ব্ব হইতে থাকিবে ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রতি অনুরাগ তত বর্দ্ধিত হইবে।

ব্রহ্মসাধনের তৃতীয় সোপান।—মুক্তির ইচ্ছা।

এই কষ্টময় অনিত্য সংসার হইতে নিত্য ও মাধুর্য্য রসের এক মাত্র আধার, সেই অমৃত নিকেতন ঈশ্বরে আশ্রয় লইবার ইচ্ছাকে মুক্তির ইচ্ছা বলা যায়। এমন অনেকে দৃষ্ট হন, যাঁহাদের সংসারের প্রতি অতৃপ্তি ও তজ্জন্য বৈরাগ্য জন্মিয়াছে কিন্তু তাহাদের যথার্থ মুক্তির ইচ্ছা নাই। তাহা হইলে আমাদের কি হইল? যদ্যপি দুঃখের কশাঘাত প্রাপ্ত হইয়াও মনে তাহা হইতে বিমুক্তির ইচ্ছার উদয় না হয়, যদ্যপি আমরা নানা ক্লেশ দ্বারা সর্ব্বক্ষণ আক্রান্ত থাকিয়া ও সংসারের অসারতা জানিয়াও সংসারের একান্ত অনুসরণ করি, তাহা হইলে আমরা ব্রহ্ম প্রাপ্তির কখন উপযুক্ত হইতে পারি না। অতএব মুক্তির ইচ্ছা মনে বলবতী করিতে থাকিবে, মুক্তির ইচ্ছা হইলে মন প্রাণ ঈশ্বরের জন্য ধাবিত হয়। কেননা সেই প্রাণ-আরাম ঈশ্বর ভিন্ন তৃপ্তিস্থল আরামের স্থল দ্বিতীয় নাই।

ব্রহ্মসাধনের চতুর্থ সোপান।—ঈশ্বরের সহবাসের জন্য ব্যাকুলতা।

যখন সংসারের প্রতি বৈরাগ্য ও মুক্তির ইচ্ছা মনে উদিত হয়, তখন ঈশ্বরের জন্য আমাদিগের একটী ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়। তৃষিত শুষ্ক-তালু মৃগ যেমন জলের জন্য ব্যগ্র, তেমনি আত্মা ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হয়। পতঙ্গ যেমন দীপাগ্নির নিকট গমন করিতে ব্যগ্র হয়, তেমনি আত্মা ঈশ্বরের মুখজ্যোতিঃ দেখিবার জন্য ব্যগ্র হয়। তাঁহাকে কি প্রকারে জানিব? কেমন করিয়া তাঁহার সহবাস লাভ করিব? তখন আত্মার এই প্রকার অনুসন্ধান উপস্থিত হয়। জননীর মধ্যে মাতাকে হারাইলে শিশু সন্তান যেমন ব্যাকুল হয়, তেমনি ঈশ্বরের জন্য আত্মা ব্যাকুল হয়। "বল কে তাঁরে জানে। কোথা গেলে দরশন পাব প্রাণের প্রাণে?" এই প্রকার উক্তি আত্মার অন্তরতম গভীরতম প্রদেশ হইতে উত্থিত হইতে থাকে। কিন্তু মোহমেঘ এখন আত্মাকে পরিত্যাগ করে না, সে সর্ব্বদা হৃদয়ে আসিয়া ঈশ্বরের নিমিত্ত ব্যাকুলতার প্রভাকে ক্ষীণতেজ করিবার চেষ্টা করে। অতএব সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে যাহাতে সেই ব্যাকুলতা মোহ-মেঘের আবরণে বিলুপ্ত না হইয়া উত্তরোত্তর প্রখর হইতে থাকে। ব্যাকুলতা উপস্থিত হইলে ঈশ্বর লাভের পথ পরিষ্কৃত হয়। ঈশ্বর ব্যাকুল আত্মাকেই শীঘ্র আলিঙ্গন করেন।

এখানে ইহা বুঝিতে হইবে যে এই ব্যাকুলতার মূল ঈশ্বরের প্রতি সেই প্রগাঢ় প্রীতি, যে প্রীতি দুঃখের কঠোর পরীক্ষা সহ্য করিতে সক্ষম। ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা আমাদিগকে তাঁহার প্রীতিতে উপনীত করিতে পারে কিন্তু সাংসারিক উপকার জন্য কৃতজ্ঞতাতে সাংসারিক মোহ থাকিতে পারে, ও কেবল তজ্জনিত প্রীতি দুঃখের কঠোর পরীক্ষা সহ্য করিতে অক্ষম হয়। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি সম্পদেও যেমন, বিপদেও তেমনি, বরং বিপদের সময় আরো বর্দ্ধিত হয়। এই প্রকার প্রীতিজনিত ব্যাকুলতাই সাধনের সোপান। সাংসারিক সকল বস্তু অসার ও ঈশ্বরই একমাত্র সার, এই প্রকার উজ্জ্বল প্রতীতি অর্থাৎ বৈরাগ্যভাবই সেই প্রীতির জনয়িতা। মনে বৈরাগ্য ভাবের উদয় না হইলে ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত প্রীতির উদয় হয় না। এই প্রীতি কেবল ব্যাকুলতা রূপ সাধনের সোপানেই অন্তর্ভূত আছে এমত নহে, কিন্তু সাধনের সকল সোপানেরই অন্তর্ভূত আছে।

ব্রহ্মসাধনের পঞ্চম সোপান।—আত্মাকে পবিত্র করা।

আমাদিগের আত্মা বস্তুতঃ নির্ম্মল পদার্থ। কিন্তু পাপের সহিত জড়িত হইয়া সে মলিন হইয়া পড়ে। পাপ হৃদয়ের মলস্বরূপ, তাহাকে ধৌত করিতে হইবে। তাহার তিনটী উপায় আছে। প্রথম পাপবোধ, দ্বিতীয় তজ্জন্য অনুতাপ,

তৃতীয় তাহা পরিহার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ও আত্ম-চেষ্টা।

প্রথম, পাপ-বোধ।—আমাদের কতক গুলি গূঢ় পাপ আছে। মোহ বশতঃ আমাদের সে সকলকে পাপ বলিয়া বোধই হয় না। অতএব ঈশ্বরের পবিত্র ভাবের সহিত আপনার হৃদয়ের ভাবের সর্ব্বদা তুলনা করিবে। ঈশ্বর নির্ব্বিকার, অপাপবিদ্ধ, নির্ম্মল ও পবিত্র স্বরূপ। তাঁহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে আপনার সমস্ত পাপ-মলা সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধি হইবে। তখন আত্মার এমন সকল গূঢ় পাপ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে যাহাকে পূর্ব্বে কখনই পাপ বলিয়া চিনিতে পারা যায় নাই, অথবা যাহা আদৌ মনশ্চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশিত হয় নাই।

দ্বিতীয়, পাপের জন্য অনুতাপ।—ঈশ্বরের নিমিত্ত ব্যাকুল আত্মার পাপ-বোধ হইলেই তজ্জন্য ভয়ানক অনুতাপ উপস্থিত হয়। আবার যে ব্যক্তি ঈশ্বরের জন্য যত ব্যাকুল তাহার পাপ তাহাকে ততই অনুতপ্ত করে। তাহাই সাধকের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। অনুতাপের সময় সাধকের কষ্টের সীমা থাকে না। তখন তিনি চারি দিক্ অন্ধকার দেখেন, কিছুতেই একটু আরাম প্রাপ্ত হন না। তখন তাঁহার সম্বন্ধে সকলি দুঃখময়, সকলি যন্ত্রণাময়, সকলি বিষময়রূপে প্রতীতি হয়। সাধকের নিকট অনুতাপের যন্ত্রণা সহস্র নরক যন্ত্রণা অপেক্ষাও অধিক কষ্টকর।

তৃতীয়, পাপ পরিহার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ও আত্মচেষ্টা।—পাপের জন্য অনুতাপ-অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইলে সেই সকল পাপবিকার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য একটী প্রবল ইচ্ছা জন্মে। কিন্তু অনেক দিনের বদ্ধমূল পাপকে উন্মূলন করা সহজ কথা নহে। অতএব তখন ঈশ্বরের নিকট ধর্ম্মবলের জন্য প্রার্থনা করিবে। ঈশ্বরের করুণাতে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া সরল মনে প্রার্থনা করিলে তিনি ধর্ম্মবল প্রদান করেন। সেই বল পাপ পরিত্যাগের প্রধান উপায় হয়। পাপপ্রবৃত্তি যত বার ধর্ম্ম প্রবৃত্তিকে পরাস্ত করিয়া বলীয়ান হউক না কেন, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে এমন বল পাওয়া যায় যে, যত্ন করিলেই সমস্ত পাপকে বিদূরিত করিতে পারা যায়। আমাদের এমন অবস্থা কখনই হইতে পারে না, যে অবস্থায় ঈশ্বর আমাদিগকে অসংশোধনীয় বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিবেন। তিনি আমাদিগকে উদ্ধার করিতে সর্ব্বদাই ব্যগ্র। তিনি "পতিত জন পাবন।" অতএব একান্ত বিশ্বস্ত চিত্তে তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর, পুনরায় বল প্রাপ্ত হইবে, পুনরায় পাপ দমনে কৃতকার্য্য হইবে। একবারে না হয় শত বার প্রার্থনা কর, শত বার চেষ্টা কর; এক সময় সকল পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেই পারিবে, তাহার সন্দেহ নাই। এই রূপে প্রার্থনার সঙ্গে আত্মচেষ্টার সংযোগ করিয়া হৃদয়ের পাপমলা সকল প্রক্ষালন করিলে আত্মা নির্ম্মল হইবে। পাপই আমাদের ঈশ্বর লাভের পথের ভয়ানক প্রতিবন্ধক। পাপের সহিত ঈশ্বরের বিপরীত সম্বন্ধ। আমরা যখন পাপের দিকে যাই তখন ঈশ্বর হইতে দূরে যাই। যতটুকু পাপ পরিত্যাগ করি, ততটুকু ঈশ্বরের সমীপবর্ত্তী হই। পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের অতি যত্নের ধন। পবিত্র আত্মাই ঈশ্বরের প্রিয় নিকেতন।

THE CHRISTIAN MYTHOLOGY.

God made the earth for the residence of man, whom he created in his own image. Scarcely had this man, the prime object of the labours of the Almighty, seen the light, when his creator set a snare for him, into which God undoubtedly knew that he must fall. A serpent, which speaks, seduces a woman, who is no way surprised at this phenomenon. Being persuaded by the serpent, she solicits her husband to eat of a fruit forbidden by God himself. Adam, the father of the human race, by this light fault draws upon himself and his innocent posterity innumerable evils, which are followed but not terminated by death. By the offence of only one man, the whole human race

incurs the wrath of God; and they are at length punished for involuntary faults with an universal deluge. God repents having peopled the earth, and he finds it easier to drown and destroy the human race, than to change their hearts.

A small number of the just, however, escaped this destructive flood; but the deluged earth, and the destruction of mankind, did not satiate the implacable vengeance of their Creator: a new generation appeared. These, though descended from the friends of God, whom he had preserved in the general shipwreck of the world, incense him by new crimes. The Almighty is represented as having been incapable of rendering his creatures such as he desired them: a new torrent of corruption carries away mankind, and wrath is again excited in the bosom of Jehovah!

Partial in his affections and preferences God, at length, casts his eyes on an *idolatrous* Assyrian. He enters into an alliance with this man, and covenants that his posterity shall be multiplied to the number of the stars of Heaven, or the sands of the sea, and that they shall for ever enjoy the favour of God. To this chosen race he reveals his will: for them, regardless of his justice, he destroys whole nations. Nevertheless this favoured race is not the more happy, or more attached to their God. They fly to strange gods, from whom they seek succours which are denied to them by their own. They frequentiy insult the God who is able to exterminate them. Sometimes he punished, sometimes consoles them; at one period he hates them without a cause; and at another he caresses them with as little reason. At last, finding it impossible to reclaim this perverse people, for whom he continues to feel the warmest tenderness, he sends amongst them his own son. To this son they will not listen, What do I say?—this beloved son, equal to God his father, is put to an ignominious death by his favourite nation! His father at the same time finds impossible to save the human race without the sacrifice of his own son. Thus an innocent God becomes the victim of a just God, by whom he is beloved: both consent to this strange sacrifice judged necessary by a God who knows that it will be useless to an hardened nation which nothing can reclaim.

We should expect that the death of this God, being useless to Isræl, must serve at least to expiate the sins of the rest of the human race. Notwithstanding the eternal alliance with the Hebrews, solemnly sworn to by the Most High, and so many times renewed, that favourite nation find themselves at last deserted by their God who could not reduce them to obedience. The merits of the sufferings and death of his son, are applied to the nations before excluded from his bounty. These are reconciled to Heaven, now become more just in regard to them, and return to grace. Yet in spite of all the efforts of God, his favours are lavished in vain: mankind continue to sin, to enkindle the divine wrath, and to render themselves worthy of the eternal punishment previously prepared and destined for the greater part of the human race.

BOULANGER.

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৮৮ শকের বৈশাখ ও জৈষ্ঠ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৩৬৩
পুস্তকালয়	১৭৪।৶১০
যন্ত্রালয়	৪০১/১৫
ডাক মাসুল	৪৪৸৵০
দানপ্রাপ্ত	৩৪
হাওলাত	৪০০
দুর্ভিক্ষে দান প্রাপ্ত	৩৭৩॥০
গচ্ছিত	১০২।৶০
	১৮৯৩।৶৫

ব্যয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৫০৮।১০
মাসিক বেতন	২৩২
যন্ত্রালয়	১৫৭॥০
ডাক মাসুল	৫২৸১০
পুস্তকালয়	১০১।৫
অনিরূপিত	৩০॥৶০
হাওলাত শোধ	১৭৪॥৶০
আলোকের ব্যয়	১৮
গৃহসংস্কারের ব্যয়	১০০
দুর্ভিক্ষের উপশমার্থ কটকে প্রেরিত	২৫০
গচ্ছিত	১০৫৸/০
	১৭৩০৸৶৫

আয়	১৮৯৩।৶৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৬৮॥/১০
	১৯৬১৸৶১৫
ব্যয়	১৭৩০৸৶৫
স্থিত	২৩১/১০

শ্রী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

১৭৮৮ শকের বৈশাখ ও জৈষ্ঠ মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৫
" কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়	৫
" মণিলাল মল্লিক	৪
" গোপালচন্দ্র মল্লিক	২
" নৃপালচন্দ্র মল্লিক	২
" রামদয়াল মুখোপাধ্যায়	৬।০
" হরচন্দ্র রায়	১
" নবীনচাঁদ বড়াল	১
" কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তি	২৶০
" বনমালী চন্দ্র	১
	৪৯।৶০

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩০
" কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়	১
" চন্দ্রকুমার দত্ত	২
	৩৩

দানাধারে প্রাপ্ত	২।/১০
আগরা ব্যাঙ্ক হইতে আনান যায় ..	৪০০
	৪৮৪৸১০

ব্যয়

পত্রিকার কাগজ খরিদ জন্য হাঁওলাত দেওয়া যায়	৪০০
দাতার অভিপ্রায় অনুসারে সমাজের প্রচলিত ব্যয়ে দান	৩০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য মেদিনীপুর সমাজে দান	১০
	৪৪০

আয়	৪৮৪৸১০
পূর্ব্বকার স্থিত	৪৯৸৶১০
	৫৩৪৸০
ব্যয়	৪৪০
স্থিত	৯৪৸০

শ্রী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

একক্ষণে ডাকের নিয়ম পরিবর্ত্ত হওয়াতে দুই খণ্ড পত্রিকা আর এক আনায় যায় না। অতএব যাঁহাদিগের দুই খণ্ড পত্রিকা একত্রে যায়, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র আর এক খণ্ডের মাসুল পাঠাইবেন।

বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম, মূল্য ।।০ আনা।

ব্রাহ্মধর্ম্মের বাঙ্গলা অনুবাদ ও তাহার তাৎপর্য্য একত্রে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে, যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা অবগত নহেন, তাঁহারদিগের বোধ সুলভার্থে কেবল বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত তাৎপর্য্য একত্র প্রকাশ করা গেল; ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্ম জ্ঞান লিপ্সু ব্যক্তি মাত্রেরই বিশিষ্ট রূপ উপকার দর্শিতে পারিবে।

ভবানীপুর চতুর্দ্দশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজের বক্তৃতা, মূল্য /০ এক আনা।

গত ৯ আষাঢ় শুক্রবার ভবানীপুর ব্রাহ্ম-সমাজের চতুর্দ্দশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বরূপ বিষয়ে যে বক্তৃতা পাঠ করেন, তাহাই পুস্তকাকারে প্রচারিত হইয়াছে।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
সহকারী সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৩। কলিগতাব্দ ৪৯৬৭। ২৭ আষাঢ় শুক্রবার।

ষষ্ঠ কল্প
চতুর্থ ভাগ
২৭৩ সংখ্যা   শ্রাবণ ১৭৮৮ শক।   ৩৭ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।
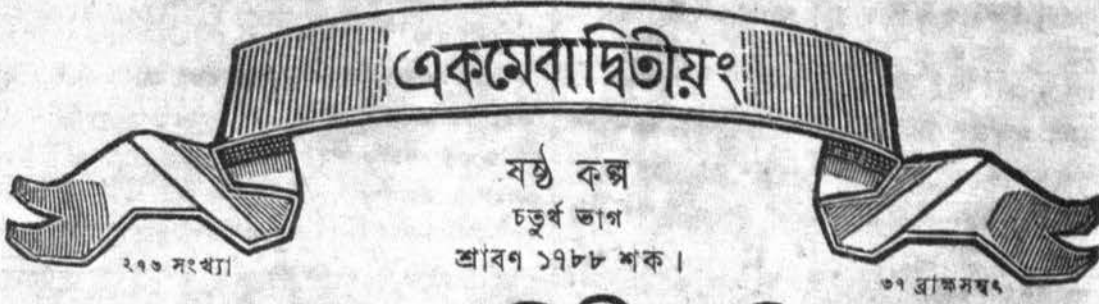
ঋগ্বেদসংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য ত্রয়োদশানুবাকে নবমং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ পংক্তিচ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

৮৭৩

১। উপো ষু শৃণুহী গিরো মঘবন্মাতথা ইব। যদা নঃ সূনৃতাবতঃ কর আদর্থয়াস ইদ্যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী।

১। হে 'মঘবন্' ধনবন্ ইন্দ্র 'গিরঃ' অস্মদীয়াঃ স্তুতীঃ 'উপো' উপৈব 'সু' 'শৃণুহি' উপগত্য সম্যক্ শৃণু। 'অতথা ইব' পূর্ব্বং যথাবিধস্ত্বং তদ্বিপরীতঃ মা 'ভূঃ'। অস্মাসু পূর্ব্বং যথানুগ্রহবুদ্ধিযুক্তস্তথাবিধএব ভবেত্যর্থঃ। অপিচ 'নঃ' অস্মান্ 'সূনৃতাবতঃ' প্রিয়সত্যাত্মিকা বাক্ সূনৃতা। তয়া স্তুতিরূপয়া বাচা যুক্তান্ যদা 'করঃ' করোষি। 'আৎ' অনন্তরং ত্বং অপি 'অর্থয়াস ইৎ' অর্থয়সে এব বাচ্যসে এব। ন তদাস্মসে অস্মাভিঃ প্রযুক্তাঃ স্তুতীস্ত্বমপি স্বীকরোষীত্যর্থঃ। অতঃ হে 'ইন্দ্র' 'তে' 'হরী' তদীয়ৌ অশ্বৌ 'নু' ক্ষিপ্রং 'যোজ' রথে যোজয়।

১। হে মঘবন্! তুমি এই স্থানে আগমন করিয়া আমাদিগের স্তুতি-বাক্য শ্রবণ ও পূর্ব্ববৎ আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর। তুমি আমাদিগকে সত্য ও প্রিয় বাক্য প্রয়োগে সমর্থ করিয়াছ, এই নিমিত্তই আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকি। হে ইন্দ্র! এ ক্ষণে তুমি স্বীয় রথে শীঘ্র অশ্বদ্বয় যোজনা কর।

৮৭৪

২। অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যব প্রিয়া অধূষত। অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী।

২। হে ইন্দ্র ত্বয়া দত্তানি অন্নানি 'অক্ষন্' যজমানাঃ ভুক্তবন্তঃ। ভুক্ত্বা চ 'অমী' 'মদন্ত' 'হি' তৃপ্তাশ্চাসন্। 'প্রিয়াঃ' স্বকীয়াঃ তনুঃ 'অব' 'অধূষত' অকম্পয়ন্ অতিশয়িতরসাস্বাদনেন বক্তুমশক্নুবন্তঃ শরীরাণ্যকম্পয়ন্। তদনন্তরং 'স্বভানবঃ' স্বায়ত্তদীপ্তয়ঃ 'বিপ্রাঃ' মেধাবিনস্তে 'নবিষ্ঠয়া' নবিতৃতময়া 'মতী' মত্যা স্তুত্যা 'অস্তোষত' অস্তুবন্। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ যোজ্যং।

২। যাজ্ঞিকেরা ত্বদ্দত্ত অন্ন ভোজন পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইয়া কলেবর কম্পিত করিয়াছিলেন। পরে সেই সমস্ত তেজস্বী বিপ্রেরা উৎকৃষ্ট স্তুতি-বাক্যে তোমাকে স্তব করেন। হে ইন্দ্র! এ ক্ষণে তুমি স্বীয় রথে অশ্বদ্বয় যোজনা কর।

৮৭৫

৩। সুসংদৃশং ত্বা বয়ং মঘবন্বং-দিষীমহি। প্র নূনং পূর্ণবংধুরঃ স্তুতো যাহি বশাঁ অনু যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী।

৩। হে 'মঘবন্' ইন্দ্র 'সুসংদৃশং' সুষ্ঠ্বনুগ্রহদৃষ্ট্যা সর্ব্বস্য দ্রষ্টারং 'ত্বা' ত্বাং 'বয়ং' 'বন্দিষীমহি' স্তবামহি। স্তুতিকর্ত্তারোভূযাস্মেত্যাশাস্যতে। অস্মাভিঃ বন্দিভিঃ 'স্তুতঃ' ত্বং 'পূর্ণবংধুরঃ' স্তোতৃভ্যঃ দেযৈঃ ধনৈঃ পূরিতেন রথেন যুক্তঃ সন্ 'বশান্' কামযমানান্ অন্যান্ যজমানান্ প্রতি 'নূনং' 'প্র' 'যাহি' অবশ্যং প্রতিষ্ঠস্ব। যোজেত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি সানুগ্রহ দৃষ্টিপাত দ্বারা সকলকে দর্শন করিয়া থাক। এক্ষণে আমরা তোমার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি সংস্তুত হইয়া রথ-মধ্যে অর্থিদিগকে প্রদানার্থ প্রচুর অর্থ লইয়া তাহাদিগের নিকট গমন কর। হে ইন্দ্র! এক্ষণে তুমি স্বীয় রথে শীঘ্র অশ্বদ্বয় যোজনা কর।

৮৭৬

৪। স ঘা তং বৃষণং রথমধি তিষ্ঠাতি গোবিদং। যঃ পাত্রং হারিযোজনং পূর্ণমিন্দ্র চিকেততি যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী।

৪। 'সঃ' 'ঘ' সঃ খলু ইন্দ্রঃ 'বৃষণং' কামাভিবর্ষকং 'গোবিদং' গবাং লম্ভযিতারং 'তং' 'রথং' 'অধিতিষ্ঠাতি' ঈদৃশে রথে অধিতিষ্ঠতু আরূঢ়োভবতু। হে 'ইন্দ্র' 'যঃ' রথঃ 'হারিযোজনং' এতৎ সংজ্ঞকং ধানামিশ্রিতং 'পূর্ণং' সোমেন পূর্ণং 'পাত্রং' 'চিকেতিতি' জ্ঞাপযতি তং রথং অধিতিষ্ঠেতি পূর্ব্বেনান্বয়ঃ। অধিষ্ঠায চ ত্বদীযৌ অশ্বৌ ক্ষিপ্রং যোজয।

৪। হে ইন্দ্র! হারিযোজন নামক সোম রসপূর্ণ পাত্র সংযুক্ত গোধন-প্রদ বাসনা-পূরক রথে আরোহণ পূর্ব্বক উহাতে অশ্বদ্বয় যোজনা কর।

৮৭৭

৫। যুক্তস্তে অস্তু দক্ষিণ উত সব্যঃ শতক্রতো। তেন জায়ামুপ প্রিয়াং মন্দানো যাহ্যংধসো যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী।

৫। হে 'শতক্রতো' বহুকর্ম্মবন্নিন্দ্র 'তে' ত্বদীযে রথে 'দক্ষিণঃ' দক্ষিণপার্শ্বস্থঃ অশ্বঃ 'যুক্তঃ' 'অস্তু'। 'উত' অপিচ 'সব্যঃ' বামপার্শ্বস্থোপি যুক্তঃ অস্তু। 'তেন' রথেন 'অংধসঃ' সোমলক্ষণস্য অন্নস্য পানেন 'মংদানঃ মত্তঃ ত্বং 'প্রিয়াং' প্রীণযিত্রীং 'জাযাং' 'উপযাহি' সা যত্র বর্ত্ততে তত্র গচ্ছেত্যর্থঃ। তদর্থং হে 'ইন্দ্র' ত্বদীযৌ অশ্বৌ রথে ক্ষিপ্রং যোজয। অনযোত্তরযাচ পীতসোমস্য ইন্দ্রস্য স্বগৃহং প্রতি প্রস্থানং প্রতিপাদ্যতে।

৫। হে ইন্দ্র! তোমার রথের দক্ষিণ ও বামে অশ্বদ্বয় যোজিত হউক। তুমি সোম-রস পানে হৃষ্ট হইয়া সেই রথে আরোহণ পূর্ব্বক প্রিয়তমার নিকট গমন কর। অতএব তোমার রথে শীঘ্র অশ্বদ্বয় যোজনা করিয়া দেও।

জগতী ছন্দঃ।

৮৭৮

৬। যুনজ্মি তে ব্রহ্মণা কেশিনা হরী উপ প্র যাহি দধিষে গভস্ত্যোঃ। উত্ত্বা সুতাসো রভসা অমংদিষুঃ পূষণ্বান্বজ্রিন্সমু পত্ন্যামদঃ। ১। ৬। ৩।

৬। হে ইন্দ্র 'কেশিনা' কেশযুক্তৌ শিখাবন্তৌ 'তে' 'হরী' ত্বদীযৌ অশ্বৌ 'ব্রহ্মণা' স্তোত্ররূপেণ মন্ত্রেণ 'যুনজ্মি' রথে সংযোজযামি। তেন রথেন 'উপ প্রযাহি'। ত্বদ্গৃহমুপগচ্ছ। 'গভস্ত্যোঃ' বাহুনামৈতৎ। বাহ্বোঃ অশ্বনক্ষকান্ রশ্মীন্ 'দধিষে' ধারযস্ব। 'ত্বা' ত্বাং 'সুতাসঃ' যজ্ঞে অভিষুতাঃ সোমাঃ 'রভসাঃ' বেগবন্তঃ তীব্রাঃ ক্ষিপ্রং মদকারিণইত্যর্থঃ। 'উদমংদিষুঃ' উৎকৃষ্টমদযুক্তমকার্ষুঃ। হে 'বজ্রিন্' অতঃ ত্বং স্বগৃহং গত্বা 'পূষণ্বান্' অত্র পূষণ্ শব্দঃ পুষ্টৌ বর্ত্ততে। পুষ্টির্ব্বৈ পূষা। পুষ্টিমেবাবরুন্ধ ইতিশ্রুতেঃ। সোমপানজনিতযা পুষ্ট্যা যুক্তঃ সন্ 'পত্ন্যা' স্বভার্য্যযা সহ 'সমু অমদঃ' সম্যগেব তৃপ্তোভব। ১। ৬। ৩।

৬। হে ইন্দ্র! আমি তোমার রথে মন্ত্র দ্বারা কেশর-জাল-সমলঙ্কৃত অশ্বদ্বয় যোজনা করিয়া দিতেছি। তুমি সেই রথে আরোহণ ও বাহু দ্বারা রশ্মি গ্রহণ করিয়া

গৃহে গমন কর। যজ্ঞে সংস্কৃত হর্ষজনক সোমরস সমুদায় তোমাকে শীঘ্র হৃষ্ট করুক। হে বজ্রধর! তুমি সোম-পান-জনিত পুষ্টি সম্পন্ন হইয়া প্রিয়তমার সহিত তৃপ্তি লাভ কর। ১। ৬। ৩।

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ।

৪ আষাঢ় রবিবার ১৭৮৮ শক।

প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

প্রার্থনা না করিতে করিতে তিনি পিতা-মাতার ন্যায় এখানেই সম্মুখে বর্ত্তমান, এখনি তিনি আমারদিগকে অভয় দান করিতেছেন। নিদাঘ-গ্রীষ্মের পর এই প্রাতঃকালে যেমন বিন্দু বিন্দু বারি-ধারা বর্ষণ করিয়া তিনি এই জগৎকে শীতল করিতেছেন, তেমনি তাঁর অমৃত বিন্দু বর্ষণ করিয়া আমারদের সন্তপ্ত আত্মাকে সুস্নিগ্ধ করিতেছেন। ভয়ে ব্যাকুল ছিলাম, তিনি অভয় দান করিলেন; এখন নির্ভয় হইলাম। তিনি নির্জ্জনে আমারদের হৃদয়ে প্রকাশ পান, তিনি মোহ-কোলাহলের মধ্যে আইসেন না। যেমন মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যকে দেখিতে পাই না, সেই রূপ মোহ-কোলাহলের মধ্যে পরমেশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই না। পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছি—যখন শান্ত-হৃদয় হইয়া বসি, তখনই সেই শান্ত-স্বরূপ আমারদের নিকটে আবির্ভূত হন। মধ্যে মধ্যে এই সমাজে অনেক সমারোহ হইয়া গিয়াছে, হয়তো সেই উৎসাহকর উৎসবের মধ্যেও আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই—আজি এই প্রশান্ত সুশীতল প্রাতঃকালে তাঁহার পবিত্র সন্নিকর্ষ কেমন উপলব্ধি করিতেছি, এই কয় জন সুহৃদে মিলে কেমন শান্ত হৃদয়ে পবিত্র ভাবে তাঁহার উপাসনা করিতেছি, আমারদের প্রতি-জনের আত্মাতে এখন তিনি কেমন আনন্দ-রূপে অমৃত-রূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার মাতৃ-স্নেহ-পূর্ণ দৃষ্টি আমারদের চক্ষুর উপরে কেমন স্থির-ভাবে এখন নিপতিত রহিয়াছে, এই শুভ ক্ষণে মোহহর পবিত্র আনন্দ অন্তর্জ্জলা নিঃশব্দ নদীর ন্যায় আমারদের অন্তরে কেমন বহমান হইতেছে, এ আনন্দের স্বর্গীয় ভাব কেমন অনুভব হইতেছে—এ আনন্দ চিরকালের আনন্দ, এ যোগ অমৃত যোগ। আমারদের প্রাণকে যে হরণ করে, সে বিষ; আমারদের প্রাণের প্রাণকে যে হরণ করে, সে মোহ। অতএব বিষ হইতেও পাপ-মোহ আমারদিগের সাংঘাতিক শত্রু। হে পরমাত্মন্! এই ভয়ানক পাপ-মোহ হইতে রক্ষা করিয়া তোমার সহিত আমারদের যোগানন্দ প্রেমানন্দকে সংবর্দ্ধন কর, যাহাতে আমরা অমৃতত্ব লাভ করিতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ভবানীপুর চতুর্দ্দশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

৯ আষাঢ় শুক্রবার ১৭৮৮ শক।

উদ্বোধন।

"সমুদয় আকাশ যাঁহার গুরু ভার বহন করিতে পারে না, সেই পরমেশ্বর এখনি এখানে অধিষ্ঠান করিতেছেন। এই উপাসনা-মণ্ডপের মধ্যে এই আকাশে আমারদের সম্মুখে সেই বিশ্বাধিপ বিরাজ করিতেছেন, এই দীপ-মালার মধ্যে তাঁর জ্যোতি প্রকাশ পাইতেছে, হৃদয়ের উৎসাহের মধ্যে সেই উৎসাহ-দাতাকে আমরা অনুভব করিতেছি। তিনি আমারদের চক্ষুর চক্ষু, তিনি আমারদের শ্রোত্রের শ্রোত্র, তিনি আমারদের মনের মন, তিনি আমারদের প্রাণের প্রাণ। তিনি

এখনি আমারদের সকলকে দেখিতেছেন। যিনি চক্ষু দিয়াছেন, তিনি কি আমাদিগকে এখন দেখিতেছেন না? যিনি কর্ণ দিয়াছেন, তিনি আমারদের বাক্য কি এখন শুনিতেছেন না? যিনি আমারদের সকল মনোবৃত্তির সহিত আত্মাকে সৃজন করিয়াছেন, তিনি কি আমারদের মনের ভাব এখন অবগত নহেন? সেই পরমেশ্বর এখনি এখানে আমারদের সকলকে দেখিতেছেন, আমাদের সকল কথা শুনিতেছেন, আমারদের মনের নিগূঢ় সকল ভাব জানিতেছেন। সেই চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, প্রাণের প্রাণ, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বর এখানে আনন্দ-রূপে অমৃত-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন; শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি উদ্দীপন করিয়া তাঁহার উপাসনাতে প্রবৃত্ত হই।"

এই উদ্বোধনের পর ব্রহ্ম সঙ্গীত হইয়া উপাসনা আরম্ভ হইল। স্বাধ্যায়ান্ত ব্রহ্মোপাসনা সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মোক্ত কয়েকটি শ্রুতি তাৎপর্য্যের সহিত পঠিত হইল। অনন্তর শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় স্বরচিত প্রবন্ধ দ্বারা সময়োচিত এই উপদেশ প্রদান করিলেন—

আজ আবার পূর্ণ এক বৎসর পরে এই পবিত্র উপাসনা-মণ্ডপে সর্ব্ব-মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের পূজা করিতে আমরা একত্রিত হইয়াছি। যাঁহা হইতে দেহ, মন, আত্মা, ও জ্ঞান ধর্ম্ম, সকলই লাভ করিয়াছি; আজ সেই বিশ্ব-বিধাতা অখিল মাতাকেই কৃতজ্ঞতা উপহার দিতে এখানে এই সুখের সায়ংকালে সকলে সম্মিলিত হইয়াছি। প্রতি দিন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি পক্ষ, প্রতি মাসে যিনি আমারদিগের আত্মাকে ব্রাহ্মধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় রক্ষা করিয়া জ্ঞান প্রীতি পবিত্রতাতে উন্নত করিতেছেন, আজ তাঁর যশোগান করিতেই এখানে এই উৎসব-দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মই এই উৎসব-আনন্দের এক মাত্র কারণ—পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মই এই অরূপ অতীন্দ্রিয় পূর্ণ-জ্ঞান পূর্ণ-শক্তি পূর্ণ-মঙ্গল পরমেশ্বরের পূজার এক মাত্র প্রবর্ত্তক। যত দিন ব্রাহ্মধর্ম্ম উজ্জ্বল বেশে এখানে প্রকাশিত হইয়াছেন, তত দিন অবধিই বঙ্গ ভূমিতে ঈদৃশ অনুপম স্বর্গীয় উৎসবের সূত্র-পাত হইয়াছে। দিব্য-ধামে দেবগণ সম্মিলিত হইয়া যে শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব-প্রথমে এই ভারত ভূমির বঙ্গ দেশেতেই সেই পবিত্র ব্রহ্ম-পূজার সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর উপাসনা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিলেন। সর্ব্ব-প্রথমে যেমন এখানকার আর্য্য জাতির মধ্যেই ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটিত হইবার রাশি রাশি নিদর্শন ইতিহাস ও পুরাবৃত্তে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমনি সর্ব্বাগ্রেই সেই আর্য্য-বংশেরই ধর্ম্মোন্নতির মহত্তর চিহ্ন-সকল এক্ষণেও প্রত্যক্ষ হইতেছে। পৃথিবীর মধ্যে কোন দেশে শিল্প-সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে, কুত্রাপি বা কৃষি-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে; কোন স্থানে বা রণ-বিদ্যা ও চিকিৎসা-বিদ্যার অভাবনীয় প্রাচুর্ভাব, কোন দেশে বা ভাষা-তত্ত্ব ও বিজ্ঞান-শাস্ত্রের ভূয়সী আলোচনা—কোন জাতি বা দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া স্বকীয় বল-বিক্রমের প্রতাপে সমুদয় ভূমণ্ডলকে প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে চারি দিকে এই সমস্ত উন্নতি ও আন্দোলনের মধ্যে ধর্ম্মপরায়ণ এক-নিষ্ঠ আর্য্য-বংশীয়েরা হিমালয় প্রদেশ হইতে গঙ্গানদীর ন্যায় প্রবাহিত হইয়া এই নির্ব্বীর্য্য বঙ্গ দেশে আসিয়া পরাধীনতার উপর পরাধীনতা সত্ত্বেও অ-

টল-ভাবে ধর্ম্ম-পথেই অগ্রসর হইতেছেন—ঈশ্বরেরই সন্নিকর্ষ লাভ করিতেছেন, আত্মার স্বাধীনতা বর্দ্ধন করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে এখানে আর্য্য-সন্তান-সকল যদিও কোন রূপ বৈষয়িক ব্যাপারের কীর্ত্তি-কলাপ বিস্তার করিতে পারিতেছেন না, তথাপি তাঁহারদিগের বংশ-পরম্পরা-অনুষ্ঠিত ধর্ম্মোন্নতির জয়স্তম্ভ-স্বরূপ ব্রহ্ম-মন্দির এই গঙ্গা-স্রোতের উপর সংস্থাপন করিয়া "একমেবাদ্বিতীয়ং" জয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন—ইহাতেই তাঁহারা পৃথিবীর সকল জাতির সকল প্রকার কীর্ত্তি অতিক্রম করিয়াছেন এবং সমগ্র ভূমণ্ডলের সমুদায় সভ্য জাতিকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছেন। বঙ্গবাসিগণ কেবল এক মাত্র ধর্ম্ম-নিষ্ঠার প্রভাবে আত্মার গভীরতর প্রদেশে অবতরণ করত তথা হইতে সমুজ্জ্বল ধর্ম্ম-রত্ন উত্তোলন করিয়া স্বীয় জাতির গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। ভূমণ্ডলের যে দেশে জ্ঞান ধর্ম্মের যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, পৃথিবীর যে স্থানে ঈশ্বর ও পরকাল বিষয়ে যাহা কিছু সত্য প্রকাশিত হইয়াছে; ভারত ভূমির বঙ্গ-ভূমির ব্রাহ্মধর্ম্ম-রূপ মহা-বৃক্ষের সহিত তুলনা করিলে ইহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক উন্নত বলিয়া সকলকেই মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।

ভূমণ্ডল-মধ্যে সকল জাতিই আপনাপন ধর্ম্ম-গ্রন্থকে ঈশ্বর-প্রণীত, এবং মনুষ্য-বিশেষকে ঈশ্বর-অবতার ও ঈশ্বরের দূত বলিয়াও স্বীকার করেন। তাঁহারদের মতে অরূপ অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর কোন না কোন রূপ ধারণ পূর্ব্বক পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; কখনো তিনি পরিমিত-বুদ্ধি পরিমিত-শক্তি অপরিণামদর্শী মনুষ্যের ন্যায় শোক-দুঃখে বিপত্তি-বিষাদে অভিভূত হইয়া বিলাপ ও ক্রন্দন করিয়াছিলেন; কখনো বা মনুষ্যের কৃতঘ্নতা দেখিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া সৃষ্টি নাশ করিতে—কুত্রাপি বা করুণা-পরবশ হইয়া জাতি-বিশেষের দাসত্ব অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঈদৃশ প্রলাপোত্থিত বাক্য-সকলকে অনেকানেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় অভ্রান্ত বলিয়া অঙ্গীকার করেন। কোন জাতি বা মনুষ্য-বিশেষকে জ্ঞান ধর্ম্মের প্রীতি পবিত্রতার পূর্ণ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করেন, কেহ বা মরণানন্তর অনন্ত নরকের কল্পনা করিয়া আত্মার অনন্ত উন্নতির পথে ভয়ানক কণ্টক-সকল আরোপ করেন। বনবাসী অসভ্য জাতির কথা দূরে থাকুক, বর্ত্তমান সময়েও এমন একটী সভ্য জাতিকে দেখিতে পাওয়া যায় না যে তাঁহারদিগের বিদ্যা বুদ্ধির সমধিক প্রাদুর্ভাব সত্ত্বেও সামান্য মনুষ্যকে আপনাদের জ্ঞান ধর্ম্মের পরিশুদ্ধ পূর্ণ আদর্শ বলিয়া অঙ্গীকার না করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মই কেবল "একমেবাদ্বিতীয়ং" পরব্রহ্মকে সমুদায় মানব-কুলের জ্ঞান ধর্ম্মের একমাত্র পূর্ণ আদর্শ বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছেন। এই বঙ্গ ভূমির আর্য্য-সন্তানেরা সমুদায় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব-প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মেরই প্রভাবে মনুষ্য-আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরকেই পূর্ণ বিশুদ্ধ আদর্শ-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাকেই কেবল ধর্ম্মপথের একমাত্র নেতা ও উপদেষ্টা বলিয়া পূজা করিতেছেন। অপরাপর সকল ধর্ম্ম-গ্রন্থই ঈশ্বরের প্রণীত বলিয়া ঘোষিত হইতেছে, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন "ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বাক্য যে কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহাই আদরণীয় তাহাই সেবনীয়; কিন্তু জীবন্ত ধর্ম্ম কোন গ্রন্থ-বিশেষে আবদ্ধ নহে।" বিশ্বতশ্চক্ষু ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর সকলেরই প্রভু, সকলেরই সুহৃদ্; অতএব তিনি সকলের আত্মাতেই

ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ স্বর্গীয় অগ্নি নিহিত করিয়াছেন। তিনি আপনার বিশুদ্ধ অনন্ত মঙ্গল রূপ এবং ধর্ম্ম-নিয়ম-সকল এই তাবৎ ভৌতিক পদার্থে ও মনুষ্যের মানস-পটে এবং আত্মার গভীরতর প্রদেশে, অবিনশ্বর অক্ষরে, চির মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। অপরাপর ধর্ম্ম-গ্রন্থে যেমন কোন মনুষ্য-বিশেষকে ঈশ্বর-প্রতিনিধি বা ঈশ্বর-অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করে, পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহা স্বীকার করেন না; ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মতে স্বর্গের কুঞ্চিকা আর কাহারও হস্তে সমর্পিত নাই। ঈশ্বর স্বয়ংই ব্রাহ্মদিগের পাপত্রাতা, ও মুক্তি-দাতা, সকলই। কি জড় জগৎ, কি ধর্ম্ম-রাজ্য; সকলেরই শাসন তাঁহারই হস্তে। তিনিই বিশ্বরাজ্যের স্রষ্টা, বিশ্বরাজ্যের পাতা, পাপের শাস্তা পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা, শুভবুদ্ধির প্রেরয়িতা ও ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক; এবং তিনিই কেবল উন্নত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের এক মাত্র নেতা। সঙ্কীর্ণ কূপ হইতে প্রশস্ত ক্ষেত্রে উপনীত হওয়া, পরিমিত হইতে অপরিমিত-স্বরূপে গমন করা, ক্ষুদ্র হইতে ভূমা ঈশ্বরকে আশ্রয় করা, দেব মনুষ্যের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলের জন্যে ঈশ্বরেরই পূজা করিয়া কেবল তাঁহারই পদে প্রণত হওয়া দেব-সেব্য ব্রাহ্মধর্ম্মের মহান্ উদ্দেশ্য। সংসারের দুর্গতি হইতে মনুষ্যের আত্মাকে অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যাওয়াই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান সঙ্কল্প।

যাঁহারা অনন্ত-জ্ঞান অনন্ত-শক্তি অনন্ত-মঙ্গল অশরীর একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে সকলের আদি-কারণ এবং বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করেন, ঈশ্বরকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই যাঁহারা তাঁহার উপাসনা বলিয়া অঙ্গীকার করেন, এবং কেবল এক মাত্র তাঁহার উপাসনাতেই যাঁহারা ঐহিক পারত্রিক সকল প্রকার মঙ্গলেরই প্রত্যাশা করেন; তাঁহারাই সেই পরব্রহ্মের উপাসক, তাঁহারাই কেবল ব্রাহ্ম শব্দের বাচ্য। যে দেশীয় যে কোন ব্যক্তি হউন, যিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ-চতুষ্টয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন, তিনিই ব্রাহ্ম উপাধির উপযুক্ত। নতুবা ইহার মধ্যে একের প্রতি অনাস্থা করিয়া অপর কয়েকটীর প্রতি আস্থা স্থাপন করিলেও তিনি ব্রাহ্ম নামের যোগ্য হন না। যদি কোন ব্যক্তি ঈশ্বরকে সকলের আদি-কারণ ও অশরীর অতীন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করত তাঁহাকে পরিমিত ভাবে পূজা করেন, তিনি যেমন ব্রহ্মের উপাসক নহেন; তেমনি যদি কোন ব্যক্তি মরণানন্তর অনন্ত স্বর্গ না মানিয়া অনন্ত নরকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, অথচ ঈশ্বরকে "শান্তং শিবমদ্বৈতং" পূর্ণ-মঙ্গল বলিয়া স্বীকার করেন; তিনিও ব্রাহ্ম শব্দের বাচ্য হইতে পারেন না। ঈশ্বরকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা—এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যে বিশ্বাস সংস্থাপন করত যদি কোন মনুষ্যকে বা কৃত্রিম দেবতা-বিশেষকে সকল বিষয়ে মানব কুলের বিমল পূর্ণ আদর্শ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া তাহার অনুসরণ ও অনুকরণেই বল বীর্য্য স্বাধীনতা, এবং জ্ঞান ধর্ম্ম পবিত্রতা প্রভৃতি ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলের প্রত্যাশা করেন; তাহা হইলে তিনি অদ্বিতীয় ঈশ্বরের নিরতিশয়-ভাবের খণ্ডন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অক্ষয় সত্যের মূলেই আঘাত করেন। ঈশ্বর যেমন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের এক মাত্র অধিপতি, তেমনি তিনিই কেবল ধর্ম্ম-রাজ্যের এক মাত্র নিয়ন্তা। তিনিই জ্যোতি, আর সকলই অন্ধকার। তিনিই

ভূমা, আর সকলই ক্ষুদ্র। তিনিই পূর্ণ, আর সকলই পরিমিত। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত এই যে ঈশ্বরই কেবল এক মাত্র সত্য সুন্দর মঙ্গল, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পূর্ণ-পুরুষ; আর তাঁহার সৃষ্ট দেব মনুষ্য সমুদায় জীবই অপূর্ণ ও অবিশুদ্ধ। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বাস এই যে মনুষ্য মহত্ত্ব ও দেবত্ব লাভ করিলেও তাহাতে পাপ মলিনতা দোষ ও কলঙ্ক থাকিতেই পারে, কেবল নিষ্পাপ নির্ম্মল নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক এক মাত্র ভূমা পরমেশ্বর। দীপালোক সেই খানেই শোভা পায়, যেখানে সূর্য্যালোক পতিত না হয়। খদ্যোতজ্যোতি সেই সময়েই মনোহর বেশ ধারণ করে, যখন চন্দ্রমার অভাবে জগন্মণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। মনুষ্য স্বীয় বুদ্ধিশক্তি, জ্ঞান ধর্ম্ম পবিত্রতার প্রভাবে তত দিনই জন-সমাজের মধ্যে ঈশ্বরের হস্তকে লুক্কায়িত রাখিয়া আপনারই মহিমা প্রকাশ করিতে পারে, আপনাকে আর্দশ বা অবতার-রূপে প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হয়; যতদিন জন-সাধারণ অজ্ঞান-অন্ধকারে ও দৃঢ়-বদ্ধ কুসংস্কারে অন্ধীভূত হইয়া পূর্ণ ঈশ্বরকে দেখিতে না পায়। সূর্য্য সমুদিত হইলে যেমন দীপালোক ম্লান হইয়া যায়, চন্দ্রমা উদিত হইলে যেমন খদ্যোত-জ্যোতি অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে; তেমনি অন্তরে "অতুল জ্যোতির জ্যোতি" ঈশ্বর প্রকাশিত হইলে মনুষ্যের সকলই ক্ষীণ হীন মলিন ও ক্ষুদ্রভাব ধারণ করে। যে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মধ্যে পূর্ণ ঈশ্বরের আবির্ভাব না হইয়াছে, সেখানে মনুষ্যেরই একাধিপত্য। এই আর্য্যভূমি ভারতবর্ষে বহু কালের বহুবিধ ধর্ম্মযুদ্ধের পর, সহস্র প্রকার মত-ভেদ ও জাতিভেদের পর, ঈশ্বর-প্রসাদে ব্রাহ্মধর্ম্ম অভ্যুদিত হইয়া নিঃসংশয়রূপে ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন—বহু যুগ-যুগান্তরের অনুসন্ধানের পর এখানে ধর্ম্মাচলের উন্নত চূড়া আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঈশ্বরই এই সমুন্নত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের এক মাত্র উপাস্য দেবতা। তিনিই তাহারদিগের স্নেহ-দাতা পিতা মাতা, সুহৃৎ সখা; তিনিই তাহারদের জ্ঞান-দাতা, পাপ-ত্রাতা, মুক্তি-দাতা, বিধাতা। এ ধর্ম্মে উপাস্য উপাসকদিগের মধ্যে কিছুরই ব্যবধান নাই, কোন প্রকার আবরণও নাই। এ ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিলে ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টি-পথে পতিত হয় না; তাঁহার মহিমা ভিন্ন ত্রিভুবনে আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। "প্রাণোহ্যেষযঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি" ইনি প্রাণ-স্বরূপ, যিনি এই সর্ব্ব ভূতে প্রকাশ পাইতেছেন। "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদোবিদুঃ"। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরা আত্ম-রূপ উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে সেই নির্ম্মল, নিরবয়ব, জ্যোতির জ্যোতি, শুভ্র পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন *"।

পৃথিবীর যাবতীয় পর্ব্বত-মালার মধ্যে যেমন ভারতবর্ষের হিমগিরিই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, তেমনি ভারতের ব্রাহ্মধর্ম্ম-রূপ উন্নত শিখর আর সকল ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। জগদ্গুরু ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল প্রকার সৃষ্ট বস্তুর অপূর্ণতা, ও মনুষ্যের ক্ষুদ্রতার পরিচয় দিয়া আমারদিগকে ভূমা ঈশ্বরেরই শরণাগত ও পদানত করিয়াছেন। এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মই কেবল মানব কুলকে "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই বিশ্ব-বিজয়ী জয়-পতাকার অনুসরণ করিতে আহ্বান করিতেছেন। সহস্র সহস্র বৎসরের যাগ যজ্ঞ তপস্যার পর; বংশ-পরম্পরা-প্রচলিত স্থাবর

* ব্রাহ্মধর্ম্ম ১ খণ্ড ৩ অধ্যায়।

জঙ্গম, পশু-পক্ষী, নর-নারী, তেত্রিশ কোটি দেবতার আরাধনা ও অর্চ্চনার পর; লোভাসক্ত বিবিধ ধর্ম্ম সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নানা প্রকার প্রপীড়নে অনির্ব্বচনীয় ক্লেশ-ভোগের পর; আমরা সত্য সুন্দর মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরকে পাইয়া আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই সমুন্নত সমুজ্জ্বল জয়-পতাকার অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা প্রকৃত ধর্ম্ম-পথে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। এই জন্য "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই পবিত্র মধুর নাম আমারদিগের এত প্রিয়—এই জীবন্ত মহা-বাক্য অন্তরে বাহিরে চিরমুদ্রিত করিয়া রাখিবার জন্য আমারদিগের এত যত্ন। এই জন্যই আমরা ঈশ্বর-উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার স্তব স্তুতি সমাপ্তির পর লোমাঞ্চিতশরীরে "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই পবিত্র শব্দ উচ্চারণ করিয়া আমারদিগের সহিত পরিমিত দেবতার উপাসকদিগের প্রভেদ নির্দ্দেশ করি। এই জন্যই আমরা তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই মৃত-সঞ্জীবন সত্য-গর্ভ মধুর নিনাদে উপাসনা-গৃহ নিনাদিত করিয়া হৃদয়ের অনুরাগ ও উৎসাহ দ্বিগুণিত চতুর্গুণিত করিয়া তুলি। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য ঈশ্বরের করুণা! যেমন শীতের পর বসন্ত, গ্রীষ্মের পর বর্ষা, নিশার পর দিবা, বাল্যের পর যৌবন, দুঃখের পর সুখের উদয় হয়; তেমনি এই বঙ্গ দেশে পৌত্তলিকতার পর ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে। চিররোগী আরোগ্য লাভ করিলে যেমন শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন-বিষয়ে তাঁহার একটি স্বাভাবিক ইচ্ছার উদ্রেক হয়, তেমনি বঙ্গবাসিগণ বহু কষ্টে পৌত্তলিকতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন বলিয়া স্বভাবতই ব্রাহ্মধর্ম্ম ও পৌত্তলিকতার মধ্যে একটী প্রশস্ত ব্যবধান রাখিবার জন্য তাঁহারদিগের এত প্রাণ-গত যত্ন উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা যে সত্য সুন্দর মঙ্গল পরমেশ্বরকে অধ্যাত্ম-যোগে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, সকলকে তাঁহারই সেবক ও উপাসক করিয়া পৃথিবীর উন্নতি সাধন করিবার জন্যই তাঁহারদিগের এই সমস্ত আয়োজন। তাঁহারা যে অমৃত পান করিয়া হৃদয় মনকে শীতল করিয়াছেন, তাহারই স্বাদগ্রহে সকলকে সমর্থ করিবার জন্য তাঁহারদিগের এত প্রয়াস। তাঁহারা ধর্ম্ম-পথের যে সমস্ত বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়-গ্রহণ করিয়াছেন; সদ্‌ভাবে সাধুভাবে ভ্রাতৃভাবে উত্তেজিত হইয়া সেই সমস্ত উৎপাত হইতে জন-সাধারণকে সতর্ক করাই তাঁহারদিগের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও আকিঞ্চন।

হে ব্রহ্ম-পরায়ণ সাধু সজ্জন সকল! তোমরা যে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছ, সেই অমৃত-তরুকে এই বঙ্গ ভুমিতে বদ্ধমূল করিবার জন্য যত্নযুক্ত হও। ব্রাহ্মধর্ম্মের অক্ষয় সত্য চারি দিকে মুক্ত হস্তে বিতরণ করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল কর। বঙ্গ ভুমির পতিত সন্তান-সকলকে পতিত-পাবনের শরণাগত করিয়া জগতে প্রকৃত ভ্রাতৃ-ভাব বিস্তার কর। জন-সাধারণকে শুদ্ধ একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের আদর্শ গ্রহণ করিতে শিক্ষা দিবার জন্য ধন প্রাণ যথা-সর্ব্বস্ব পণ করিয়া জীবনের সার্থক্য সম্পাদন কর। স্বাধীন-ভাবে অনুদ্ধত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কর; তোমারদের পিতৃ-পুরুষগণের সদ্‌ভাব ধর্ম্ম-ভাবকে অবজ্ঞা করিও না। তাঁহারা প্রকৃত ব্রহ্ম-জ্ঞানের অভাবে অকিঞ্চিৎকর পৌত্তলিকতার আশ্রয়ে থাকিয়াও—অকৃত অমৃত ঈশ্বরকে পরিমিত-ভাবে পূজা করিয়াও যে সমস্ত উদারতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন,

তোমরা সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াও কি তাহা হইতে আরো মহত্ত্ব প্রকাশ করিবে না। তাঁহারা ধর্ম্মের জন্য নিঃস্বার্থ-ভাবে যে সমস্ত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, অম্লান বদনে অভিমান-শূন্য হইয়া যে সকল ইন্দ্রিয়-সুখ, বিষয়-সুখ, বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাহা স্মরণ হইলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, মন উদার-ভাব ধারণ করে। তাঁহারদিগের প্রাণ-গত ধর্ম্ম-নিষ্ঠা, আন্তরিক ঈশ্বর-প্রীতি, অচলা ভগবদ্ভক্তির কত অযুত নিদর্শন অদ্যাপি এই ভারত ভূমিতে গগন ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এ দেশের আতিথ্য পরম ধর্ম্ম,ধর্ম্ম-ঘটিত ক্রিয়া-কলাপে অকাতরে অর্থ ব্যয় করাই এখানকার মহত্ত্বের চিহ্ন। নগর গ্রামে,বন উপবনে, পর্ব্বত কন্দরে, নদ নদী সমুদ্রকূলে,যেখানে যাইবে; সেইখানেই আর্য্য-বংশের সহস্র সহস্র ধর্ম্ম কীর্ত্তি লক্ষিত হইবে। নদীর স্রোত শুষ্ক ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, নগর গ্রাম বন উপবনে পরিণত হইয়াছে, রাজ্য ও রাজা বিনষ্ট হইয়াছে; তথাচ তাহার অভ্যন্তরে আর্য্য-জাতির প্রস্তর-নির্ম্মিত মহা-মূল্য ধর্ম্ম-কীর্ত্তি-সকল এখনো অটল-ভাবে বিরাজ করিতেছে। হিমালয় অঞ্চল হইতে সাগর তীর পর্য্যন্ত, সকল স্থানই আর্য্য-কীর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। ব্রহ্মাবর্ত্তের পবিত্র সরস্বতী নদী কূলে, যেখানে তাঁহারা ঈশ্বর-উদ্দেশে যাগ যজ্ঞ তপস্যা করিতেন; আর এখানকার এই গঙ্গাতীরে, যেখানে ব্রাহ্মধর্ম্মানুযায়ী ব্রহ্ম-যজ্ঞ আরব্ধ হইয়াছে; ইহার মধ্য-গত সকল স্থানেই আর্য্য-বংশের সমাগমের চিহ্ন-স্বরূপ শোভনতম ধর্ম্ম-মন্দির সকল দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তাঁহারদিগের ধর্ম্মকীর্ত্তি-সকল যেমন পৃথিবীর সকল কীর্ত্তিকে অতিক্রম করিয়াছে, সেই রূপ তাঁহারদিগের বহুযত্ন-লব্ধ সত্য-রত্নের মালা-স্বরূপ ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থও ভূমণ্ডলের সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্রেরই সারভূত ও পরাকাষ্ঠা হইয়াছে।

আশ্চর্য্য! যেমন সাগর-গর্ভ বিদীর্ণ করিয়া বাড়বানল প্রজ্বলিত হইয়া থাকে; তেমনি সপ্তত্রিংশ বৎসর হইল, এই বল-হীন নিরীহ বঙ্গ-দেশে ব্রহ্ম-জ্ঞান-রূপ স্বর্গীয় অনল সকলের হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে; এবং ইহার আলোকে ঈশ্বরের স্বরূপ-ভাব প্রকাশিত হইয়া পৌত্তলিকতার দুর্ভেদ্য দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে সকলে মুক্তি পাইয়াছে।

হে জগদীশ! এ কেবল তোমারই করুণা, তোমারই করুণা! তুমি আমারদিগকে নিরাশ্রয় দেখিয়া, স্বয়ংই আশ্রয় প্রদান করিয়াছ—পথ-হারা দেখিয়া স্বয়ংই আমারদের পথ প্রদর্শক হইয়াছ। তুমি আমারদিগকে নির্জীব ও মৃত-কল্প দেখিয়া স্বয়ংই আমারদের আত্মাতে অমৃত বারি সিঞ্চন করিয়া পুনর্জ্জীবিত করিতেছ। তুমি আমাদের দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রেরণ করিয়া জ্ঞান বীর্য্য সুখ সৌভাগ্য লাভের সহস্র দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছ। বঙ্গভূমির যে এত দুর্দ্দশা, তাহা কেবল তোমাকে ভুলিয়াই; বঙ্গবাসীগণের যে এত দুর্ব্বলতা, সে কেবল প্রবল পৌত্তলিকতারই দোষে।

হে দীন দয়ালু অভাজন-গতি পরমেশ্বর! তুমি কৃপা করিয়া স্বয়ংই এখন আমারদিগের নিকটে সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইয়াছ। কেবল তোমারই প্রকাশে আমরা আমারদের ক্ষুদ্রতা ও মলিনতা বুঝিতে পারিয়া তোমার চির-শরণাগত ও পদানত হইয়াছি। আমরা আমারদিগের বল বীর্য্য, সুখ সৌভাগ্য, প্রীতি পবিত্রতা তোমারই প্রসন্নতা হইতে প্রত্যাশা করিতেছি। শুদ্ধ কেবল তোমারই উপাসনাতে আমারদিগের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল হইবে, এই দৃঢ়

বিশ্বাস তোমার প্রতিই স্থাপন করিয়া তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি—তুমিও আমারদিগের অন্তরে থাকিয়া অভয় দান করিতেছ—তুমি স্বয়ংই স্নেহময় সুধাময় উপদেশ দিয়া আমারদের মুক্তির পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিতেছ।

হে জগদীশ! তুমি তোমার যে প্রসন্ন মুখ এক বার আমারদিগের নিকটে প্রকাশ করিয়াছ, তাহা আমারদের সম্মুখে চির কাল প্রকাশিত রাখ। হে পতিত-পাবন অকুল-কাণ্ডারী পরমেশ্বর! তুমি গতিহীন অসহায় বঙ্গদেশে যে উন্নত ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রেরণ করিয়াছ, তুমি স্বয়ংই সেই পবিত্র ধর্ম্মকে রক্ষা কর। পৃথিবী হইতে অধর্ম্ম-জনিত বিবাদ কলহ, বিদ্বেষ-মলিনতা, সংকোচ ক্ষুদ্রতা বিদূরিত করিয়া সমুদায় মানব জাতিকে কেবল তোমারি সেবক ও তোমারি উপাসক করিয়া জগতে "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই বিশ্ব-বিজয়ী ব্রহ্ম নামের জয়-পতাকাকে রক্ষা কর। তোমার সুমধুর স্তুতি গানে ধরা ধাম পূর্ণ করিয়া এই মর্ত্ত্য লোকেই স্বর্গের আভাস প্রদর্শন কর—কায়-মনো-বাক্যে এই মাত্র প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং"

অনন্তর শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করিলেন—

"হে জগদীশ্বর! তুমি যখন কৃপা করিয়া এই বঙ্গ ভূমিতে তোমার ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছ, তুমি তাহাকে সংরক্ষণ কর। সপ্ত ত্রিংশ বৎসরাবধি তোমার এই অব্যাহত ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-স্রোত ক্রমাগত এই বঙ্গ ভূমিতে প্রবাহিত হইয়া সকলের জ্ঞানকে পরিষ্কার করিতেছে, সকলের হৃদয়কে পবিত্র করিতেছে, সকলের কর্ম্মকে পরিশুদ্ধ করিতেছে। জ্ঞান ধর্ম্ম প্রীতি তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে উন্নত ভাব ধারণ করিতেছে। এই বঙ্গ ভূমির দুর্ব্বলতার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বলে তাহার উন্নতির প্রত্যাশা। যখন তুমি সেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে নির্ব্বীর্য্য বঙ্গ ভূমিতে প্রেরণ করিয়াছ, সেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে তুমি স্বয়ংই রক্ষা করিবে। সূর্য্যের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রাতঃকালে উদিত হইয়া কুজ্ঝটিকা ও বাষ্পে সময়ে সময়ে আচ্ছাদিত হইতেছে—তাহা দেখিয়া আমরা নানা ভয়ে ভীত হইতেছি। হে পরমেশ্বর! হে ভয়-হরণ! সেই ভয় হইতে পরিত্রাণ কর—সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ব্রাহ্মধর্ম্ম ভিন্ন আমারদের আর গতি নাই। আমারদের বঙ্গ ভূমি কেবল তোমারি ব্রাহ্মধর্ম্মের বলে পাপ-তাপ হইতে মুক্ত হইবে, অজ্ঞান-মোহ হইতে মুক্ত হইবে, ক্ষুদ্রতা সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত হইবে, মদ মাৎসর্য্য হইতে মুক্ত হইবে—সেই তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের বলে আমারদের সকলি উন্নত হইবে, এই প্রত্যাশা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি। হে পরমাত্মন্! তুমি ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা কর। সকল দিক্ শূন্য দেখি, যদি তুমি হৃদয়ে পূর্ণ না থাক। তুমি এই হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া থাকিলে কেহই ভয় দিতে পারে না। হে পরমাত্মন্! তুমি ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া তোমার উৎসাহ-কর কল্যাণ-রূপ আমারদের নিকটে সর্ব্বদা প্রকাশিত রাখ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং"

অবশেষে ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া সমাজ ভঙ্গ হইল।

তত্ত্ববিদ্যা।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রজ্ঞা-ঘটিত মূল তত্ত্ব।

এক্ষণে প্রজ্ঞা-ঘটিত মূল তত্ত্ব কি কি, তাহাই অন্বেষণ করা যাইতেছে। ইতিপূর্ব্বে যে কয়েকটি মূল তত্ত্ব নির্ণীত হইল, প্রজ্ঞা-

নিহিত সত্য-ভাবই তাহারদিগের অবশ্যম্ভাবিতার নিদান-স্বরূপ। দেশ অবশ্যই দীর্ঘে প্রস্থে এবং বেধে অপরিসীম বিস্তৃত হইবে; কাল অবশ্যই ভুত হইতে বর্ত্তমানে ও বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যতে অবিরাম বহমান হইবে; বিষয়ী অবশ্যই এক, ভাবাত্মক ও স্বাধীন হইবে; বিষয় অবশ্যই অনেক, অভাবাত্মক ও পরাধীন হইবে—ইত্যাদি অবশ্যম্ভাবিতা কোথা হইতে আসিতেছে? আমি বলিতেছি—অথবা অন্য কেহ বলিতেছে—বলিয়া নহে; পরন্তু মূল সত্যেরই বলে উক্ত তত্ত্ব-সকল অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে। যিনি সকল সত্যের মূল, তিনিই মূল সত্য এবং বিশেষতঃ আমারদের অন্তরে এই যে একটি মূল সত্যের ভাব বর্ত্তমান আছে, ইহার যিনি মূল, তিনিই সেই মূল সত্য। এই মূল সত্যে অবিশ্বাস করিলে বিশ্বাস করিবার আর কিছুই থাকে না; যে ব্যক্তি বলে যে "মূল সত্য নাই" তাহার প্রতি বক্তব্য এই যে "তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য কি মিথ্যা? তোমার কথা যদি সত্য হয়, তবে উহার মূলে সত্য থাকাতেই উহা সত্য হইয়াছে, নতুবা আর কিসের গুণে উহা সত্য হইল? সুতরাং মূল সত্য যে অবশ্যম্ভাবী, উহা তোমার আপন কথা অনুসারেই সিদ্ধান্ত হইতেছে।" এই মূল সত্যই সৎ শব্দের অভিধেয়। বন শব্দের সহিত বন্য শব্দের যে রূপ সম্বন্ধ সৎ শব্দের সহিত সত্য শব্দেরও সেই রূপ সম্বন্ধ। বনের গুণেই যেমন পশু-বিশেষ বন্য শব্দে অভিহিত হয়, সেই রূপ সতের গুণেই বস্তু-সকল সত্য শব্দের বাচ্য হইয়াছে; অতএব সৎ এবং মূল সত্য উভয়ের একই অর্থ। মূল সত্য যখন আছেন, তখন তিনি চিরকালই আছেন; কেন না তিনি যদি কোন এক সময়ে না থাকিতেন, তাহা হইলে পরক্ষণে তিনি কোথা হইতে আসিবেন? শূন্য—অভাব—অসত্য হইতে সত্য কি রূপে বিনির্গত হইবে? "কথমসতঃ সজ্জায়েত"। পূর্ব্বে যদি অভাব মাত্র ছিল, তবে পরেও অভাব মাত্র না থাকিবার সম্ভাবনা কি? অতএব মূল সত্য সর্ব্বক্ষণই বিদ্যমান আছেন—যখন কোন জীবাত্মাই ছিল না, তখনও সেই মূল সত্য বর্ত্তমান ছিলেন, এখনো তিনিই বর্ত্তমান আছেন। সেই যে পুরাতন এবং সনাতন সত্য, তিনি যেমন আমারদের মুখের কথার উপর নির্ভর করেন না, যেমন তিনি আমারদের শারীরিক মানসিক অথবা আধ্যাত্মিক বলে স্থিতি করেন না: সেই রূপ তিনি অন্য কাহারো উপর নির্ভর করেন না, অন্য কাহারো বলে স্থিতি করেন না; তিনি আপনারই উপর নির্ভর করেন, আপনারই বলে স্থিতি করেন—তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনি আমারদের এই আধুনিক জ্ঞানের গুণে সত্য হয়েন নাই, প্রত্যুত সেই সত্যেরই গুণে আমারদের এই জ্ঞান সত্য হইয়াছে; আমরা আপনার বলে তাঁহাকে জানিতেছি না, প্রত্যুত তিনি আমাদিগকে জ্ঞান প্রেরণ করাতেই আমরা তাঁহাকে জানিতেছি; তিনি অবিতথ সত্যরূপে আমারদের সমক্ষে স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে কাযে কাযেই জানিতেছি। এমন কখনই হইতে পারে না যে তিনি বাস্তবিক এক রূপ হইয়া আর এক রূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। প্রত্যুত ইহাই বিশ্বাস যোগ্য যে মূল সত্য আপনার ভাব, যাহা আমাদের আত্মাতে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, তদ্দ্বারা তিনি যথার্থ রূপেই আপনার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। আমারদের আত্ম-জ্ঞান যেমন আমারদের আত্মার স্বরূপের যথার্থই পরিচয় দিতেছে; সেই রূপ মূল সত্য

এবং মূল সত্যের প্রজ্ঞা-গত ভাব, এ দুয়ের মধ্যে কোন প্রকারেই বিরোধ স্থান পাইতে পারে না; উদাহরণ যথা—যদি মূল সত্যের ভাব একমেবাদ্বিতীয়ং ও পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে সাক্ষাৎ যিনি মূল সত্য তাঁহারই যে ঐ সকল লক্ষণ, ইহাতে আর সংশয় হইতে পারে না। এক্ষণে মূল সত্যের স্বতঃ-সিদ্ধ লক্ষণ কি তাহাই নির্ণয় করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ—অবশ্যম্ভাবী মূল সত্যের ভাব যাহা আমারদের অন্তরে বিরাজিত আছে, তাহা সকল সত্যের সম্বন্ধেই এক মাত্র অদ্বিতীয়; কারণ এই মূল সত্য-ভাব অনুসারেই আমরা আপনাকে সত্য বলিতেছি, ইহারই অনুসারে আমরা অন্য ব্যক্তিকে সত্য বলিতেছি এবং এই একই সত্য ভাব অনুসারে কি জ্ঞান, কি জড়, সকলকেই আমরা সত্য বলিতেছি; অতএব সাক্ষাৎ মূল সত্য—যিনি উক্ত সত্য-ভাবের প্রবর্ত্তয়িতা—তিনি যে যথার্থই একমেবাদ্বিতীয়ং, ইহার কদাপি অন্যথা হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ—এই অন্তর্নিহিত মূল সত্য-ভাব অনুসারেই আমরা বস্তু-সকলের সদাত্মক বা ভাবাত্মক লক্ষণ-সকল অবগত হই—অর্থাৎ যাহা যে পরিমাণে এই মূল সত্য ভাবের অনুযায়ী, তাহাকে সেই পরিমাণেই ভাবাত্মক বলিয়া অবধারণ করি। যথা—জ্ঞান উক্ত সত্য-ভাবের অনুযায়ী হওয়াতে উহাকে আমরা ভাবাত্মক বলিয়া নিশ্চয় করি, মূঢ়তা সে রূপ না হওয়াতে ইহাকে আমরা অভাবাত্মক বলিয়া স্থির করি; সুতরাং মূল সত্যে সকল প্রকার ভাবাত্মক লক্ষণই বিদ্যমান আছে, এবং কোন অভাবাত্মক লক্ষণই তাঁহার রূপকে কলঙ্কিত করিতে পারে না। উদাহরণ—জড় বস্তুর জ্ঞেয়ত্ব লক্ষণ আছে কিন্তু জ্ঞাতৃত্ব লক্ষণ নাই; সুতরাং জ্ঞেয়ত্ব উহার ভাবাত্মক লক্ষণ এবং অজ্ঞাতৃত্ব বা অজ্ঞতা উহার অভাবাত্মক লক্ষণ। আমারদের আত্মা আপনাকে আপনি জানে; সুতরাং ইহাতে জ্ঞেয়ত্ব লক্ষণও আছে এবং জ্ঞাতৃত্ব লক্ষণও আছে। এই রূপ জড় বস্তুর জ্ঞেয়ত্ব-রূপ ভাবাত্মক লক্ষণ যেটি, তাহা আমারদের আত্মাতে আছে; কিন্তু তাহার অজ্ঞতা রূপ অভাবাত্মক লক্ষণ যেটি, তাহা আমাদের আত্মাতে নাই। কিন্তু আমাদের এই আত্মাতে এক দিকে যেমন জ্ঞাতৃত্ব-জ্ঞেয়ত্ব-রূপ ভাবাত্মক লক্ষণ দৃষ্টি-গোচর হয়, অন্য দিকে আবার উহাতে অল্পজ্ঞতা-রূপ অভাবাত্মক লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে বক্তব্য এই যে পরমাত্মাতে সকল ভাবাত্মক লক্ষণই বিদ্যমান আছে—সুতরাং জ্ঞাতৃত্ব এবং জ্ঞেয়ত্ব রূপ যে দুই জ্ঞান-সম্বন্ধীয় ভাবাত্মক লক্ষণ জীবাত্মাতে অবস্থান করে, সে দুই লক্ষণও তাঁহাতে অবশ্যই বিদ্যমান আছে—কিন্তু পূর্ব্বোক্তে অল্পজ্ঞতা রূপ অভাবাত্মক লক্ষণ, যাহা দেখা গেল, তাহা পরমাত্মাতে কদাপি স্থান পাইতে পারে না। আর আর লক্ষণ সম্বন্ধেও এই রূপ—অর্থাৎ পরমাত্মাতে মঙ্গল-ভাবের এক টুকুও অভাব নাই, সুতরাং তাঁহাতে অমঙ্গল ভাবের সম্পূর্ণই অভাব আছে; তাঁহাতে জ্ঞানের এক টুকুও অভাব নাই, অজ্ঞানের সম্পূর্ণই অভাব আছে; স্বাধীনতার এক টুকুও অভাব নাই, পরাধীনতার সম্পূর্ণই অভাব আছে। এই রূপ পরমাত্মাতে ভাবের অভাব নাই, প্রত্যুত অভাবেরই অভাব আছে—অর্থাৎ তাঁহাতে কোন কিছুরই অভাব নাই; অতএব পরমাত্মা সর্ব্বতোভাবে ভাবাত্মক, তিনি পূর্ণ।

তৃতীয়তঃ—পরমাত্মা যে সম্পূর্ণ-রূপে স্বাধীন, তাহা ইতি পূর্ব্বে যথোচিত রূপে স্থাপিত

হইয়াছে। যখন বলা হইয়াছে যে সমুদায় জগতের সম্বন্ধে পরমাত্মা অদ্বৈত, পূর্ণ এবং স্বাধীন; তখন তাঁহার সম্বন্ধে জগৎ যে দ্বৈত-সাপেক্ষ, অপূর্ণ এবং আশ্রিত, ইহা আর বলিবার অবশিষ্ট নাই। পরমাত্মার দ্বিতীয় একেবারে অসম্ভব, জগতের প্রত্যেক বস্তুর দ্বিতীয় সর্ব্ব প্রকারে আবশ্যক; পরমাত্মার কিছুরই অভাব নাই, জগৎ অভাব দ্বারা নিয়তই ভ্রাম্যমান হইতেছে; পরমাত্মা আপনারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আছেন, জগৎ অন্যের আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না।

পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন যে, জগতের এক বস্তু অপর যে কোন বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাও আবার অন্য আর এক বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে; এবং যে সকল বস্তু পরস্পরাশ্রিত, তাহারাও আর একটি কোন সাধারণ আশ্রয়ের অবলম্বন ব্যতীত থাকিতে পারে না। উদাহরণ—পৃথিবীর পরমাণু-সকল পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া আছে; এক পরমাণু নিকটস্থ আর এক পরমাণুকে* এক দিকে আকর্ষণ করিতেছে এবং শেষোক্ত পূর্ব্বোক্তকে তাহার বিপরীত দিকে আকর্ষণ করিতেছে; এই রূপ আশ্রয়-সম্বন্ধে একের যাহা অভাব, অন্যে তাহা মোচন করত পৃথিবীর তাবৎ পরমাণু এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই পরমাণু-সকলের পরস্পর সংযোগ-সাধক একটা কোন আশ্রয় যে অবশ্যই মূলে আছে, ইহা প্রথমতঃ সহজেই প্রতীয়মান হয়; পশ্চাতে অনুসন্ধান দ্বারা জানা যাইতে পারে যে পৃথিবীর মধ্যস্থিত কেন্দ্রই সেই আশ্রয়-স্থান—কেন না ইহারই এক মাত্র আকর্ষণ বশতঃ পৃথিবীস্থ তাবৎ পরমাণু পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে ক্ষমবান্ হইয়াছে। যেমন আকর্ষণাদি জড়-শক্তির আশ্রয়ে জড় বস্তু-সকল অবস্থিতি করে, সেই রূপ আবার জ্ঞান প্রেমাদি চেতন-শক্তির আশ্রয়ে চেতন পদার্থ-সকলকে নির্ভর করিতে দেখা যায়। আত্মাদিগের মধ্যে পরস্পর সদ্ভাবের সঞ্চার হইলে এক আত্মা অন্য আত্মাকে কেমন আশ্চর্য্য রূপে ধারণ করিয়া থাকে। প্রিয় ব্যক্তি নিকটে থাকিলে রোগ শোকের কেমন উপশম হয়; পিতা পুত্রের আত্মার মধ্যে কেমন এক নিগূঢ় বন্ধন অবস্থিতি করে; ঈশ্বর-পরায়ণ সাধু ব্যক্তি নিকটে থাকিলে মৃত্যু কালেও কেমন অভয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এরূপ কেন হয়? না ঈশ্বরের পূর্ণ ভাব, সমুদায় আত্মাকে গূঢ় রূপে আকর্ষণ করাতে উহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত এক না এক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেছে এবং সকলেই স্ব স্ব জীবন ধারণে অনুরাগী ও উদ্যোগী হইতেছে। জীবনের প্রতি অনুরাগই জীবনের মূল; এই অনুরাগ শিথিল হইলে জীবনের মূলও শিথিল হইয়া যায়। ঈশ্বরের পূর্ণ জীবন্ত ভাব যাঁহারদের অন্তর্দৃষ্টি-পথে যত স্পষ্ট-রূপে আবির্ভূত হয়, তাঁহারা আপনারদিগের জীবনের উন্নতি পক্ষে তত অধিক অনুরাগী হন, এবং এই অনুরাগ-আহুতি প্রাপ্ত হইলে তাঁহারদের জীবন-শিখা আরও তেজস্বী ও উর্দ্ধগামী হইতে থাকে। কিন্তু যাঁহারদের মনে ঈশ্বরের ভাব এখনো যথোচিত পরিস্ফুট না হইয়াছে, তাঁহারদের চক্ষে জীবন কখন কখন শূন্য রূপ ধারণ করে; এ অবস্থায় সাধু-সঙ্গই তাঁহারদের পক্ষে মহৌষধ—কেননা যথার্থ সাধু ব্যক্তির আত্মোৎসাহে অনেক নির্জীব হৃদয় জীবন পাইয়া কৃতার্থ হয়, তাঁহার জ্ঞানালোকে অনেক পথ-হারা পথিক পথ অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হয়। আত্মাদিগের মধ্যে এই যে আশ্রয়-আশ্রিত-ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, এক মাত্র পর-

মাত্মা সকলের মূলে থাকাতেই এ রূপ হইতে পারিতেছে। তিনি মূলে থাকাতেই সকল আত্মা একই পূর্ণ ভাবের দিকে অগ্রসর হইতে উৎসুক হইতেছে এবং যে যত পূর্ণতার মাত্রা সঞ্চয় করিতেছে, সে সেই পরিমাণে অন্যান্য ব্যক্তিদিগের আত্মাতে অনুরাগ ও জীবন সঞ্চার করিয়া তাহারদিগকে উন্নতির পথে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছে। অতএব এক বস্তুর আশ্রয় অন্য বস্তু,তাহার আশ্রয় আর এক বস্তু—জগতের তাবৎ পদার্থই এই প্রকারে চলিতেছে। এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে উহারদের চরম আশ্রয়-দাতা কে? এ প্রশ্ন কোন রূপেই নিবারণীয় নহে। চরম আশ্রয় কেবল তিনিই হইতে পারেন, যিনি আপনারই আশ্রয়ে আপনি স্থিতি করিতেছেন, যিনি সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীন—পরমাত্মাই সমুদায় জগতের এক মাত্র মূলাধার।

এক্ষণে প্রজ্ঞার স্বতঃ-সিদ্ধ লক্ষণ-সকলের প্রতি মনোনিবেশ করা যাইতেছে। প্রথমতঃ—বুদ্ধি এক এক পদ করিয়া সাধারণ হইতে সাধারণ তত্ত্ব-সকলে আরোহণ করে, প্রজ্ঞা একেবারেই সর্ব্বোপরিস্থ সত্যে মস্তক উন্নত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। সত্যের সত্য, আত্মার আত্মা, পরমাত্মাই উহার চরম পর্য্যাপ্তিস্থল। সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা স্বয়ং প্রজ্ঞার আকর হওয়াতে এক জনের আত্মাতে প্রজ্ঞা যাহা বলে, তাহা সকল আত্মা হইতেই সায় পায়—প্রজ্ঞা সার্ব্বভৌমিক।

দ্বিতীয়তঃ—অপূর্ণ জগতে আমারদের প্রজ্ঞা কখনই তৃপ্তি লাভে সমর্থ হয় না—কেন না জগতের সর্ব্বত্র ই সত্যের অভাব দেদীপ্যমান রহিয়াছে, কেবল ঈশ্বরেতে লেশ মাত্রও সত্যের অভাব নাই। যখন অপূর্ণ কিছুতেই প্রজ্ঞার তৃপ্তি হয় না, তখন ইহা বলা বাহুল্য যে পূর্ণ-স্বরূপই উহার এক মাত্র উপজীব্য; তাঁহারই প্রসাদ উপভোগ করিয়া উহা নিত্য নিত্য উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। প্রজ্ঞাকে যখন আমরা দেখি, তখন দেখি যে স্বয়ং ঈশ্বর হইতে উহা অবতীর্ণ হইতেছে; এবং ঈশ্বরের মাহাত্ম্যের প্রতি আমারদের বিশ্বাস এত প্রবল যে তাঁহার নিকট হইতে অল্প কিছু পাইয়া আমারদের আশার কোন মতেই নিবৃত্তি হয় না। যাঁহার ভাণ্ডার অক্ষয়, তাঁহার কি দান অক্ষয় হইবে না? অতএব সাক্ষাৎ তাঁহার নিকট হইতে আমরা যাহা কিছু প্রাপ্ত হই, তাহা হইতে আরো অধিক প্রাপ্তির জন্য আমারদের মন প্রত্যাশাপন্ন না হইয়া কোন রূপেই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। পূর্ব্বে আমারদের কিছুই ছিল না—তিনি যে কারণে আমারদিগকে এই অল্প কিছু প্রদান করিলেন, সেই একই কারণের উপর নির্ভর করিয়া আমরা প্রত্যাশা করিতেছি যে তিনি যখন আমারদের প্রার্থনার পূর্ব্বে আমারদের মহৎ অভাব-সকল পূর্ণ করিয়াছেন, তখন আমারদের স্বভাব-সিদ্ধ অনিবার্য্য প্রার্থনা তিনি কেন না পূর্ণ করিবেন? এবং এ প্রত্যাশার যখন তিনি নিজেই মূল, তখন তিনি যে উহা পূর্ণ করিবেনই, তাহাতে আর সংশয় হইতে পারে না। আমরা যেমন দেখিতেছি যে তিনি স্বয়ং প্রজ্ঞা দ্বারা আমারদের আত্মার অভাব মোচন করিতেছেন, তেমনি ইহাও প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছি যে উক্ত মঙ্গল কার্য্যে তিনি কখনই কৃপণতা করিবেন না; অতএব ঈশ্বর-প্রসাদে আমারদের প্রজ্ঞা যে চির উন্নতিশীল, ইহা আমরা জানিয়াছি।

তৃতীয়তঃ—প্রজ্ঞার পরিস্ফুটন দ্বারা আমরা স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হইতেছি। ঈশ্বর আমারদের অন্তরে প্রজ্ঞাকে পরিস্ফুট করা-

তেই আমরা স্বাধীনতার দিকে অহরহ অগ্রসর হইতেছি। যৌবন কাল পর্য্যন্তই আমারদের শারীরিক উন্নতির সীমা; কিন্তু আমারদের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভের সীমা নাই। বাল্য, যৌবন, জরা—ইহারা এক দিকে যেমন মৃত্যুতে উপনীত হইবার সোপান, অন্য দিকে সেই রূপ মৃত্যুকে পরাজয় করিবার সোপান—স্বাধীনতা-শিখরে বা মুক্তি-ধামে যাত্রা করিবার পান্থশালা। যখন শরীর ক্ষয় হইতে থাকে, বিষয়াকর্ষণ শিথিল হইতে থাকে, ইন্দ্রিয়-সকল নির্ব্বাণ হইতে থাকে ও বিষয়-বুদ্ধি অবসর লইতে থাকে; তখন কাজেই প্রজ্ঞা পরিস্ফুট হয় ও আত্মার স্বাধীনতা পারমার্থিক রাজ্যের দিকে অবিরত উদ্ধৃত হয়। ঈশ্বর-প্রসাদে আমারদের প্রজ্ঞা উন্নতি লাভ করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না—উহা যত উন্নত হয়, ততই চতুর্দ্দিকে আপন প্রভাব বিকীর্ণ করিতে থাকে। প্রজ্ঞার প্রভাব দেহ মনের উপরে, উৎকৃষ্ট জীব ও নিকৃষ্ট জীবের উপরে, সহৃদয় আত্মীয়দিগের মধ্যে। জগৎ সংসারে প্রজ্ঞা যত উজ্জ্বল-ভাবে স্ফূর্ত্তি পাইবে, ততই জীবাত্মা-সকল একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মের অধীন হইয়া, ব্রহ্মবান্ হইয়া, স্বাধীন-ভাবে কার্য্য করিবে—ইহাতে জন-সমাজে পরম সুশৃঙ্খলা সমানীত হইবে। জ্ঞান যাহা বলে, তদনুসারে চলাই যদি স্বাধীনতা হয়, জ্ঞানের অধীন হওয়াতেই যদি স্বাধীনতা হয়; তবে পূর্ণ-জ্ঞান-স্বরূপের অধীন হইলে আমারদের স্বাধীনতা কত না প্রবর্দ্ধিত হইবে? প্রজ্ঞার প্রভাব পরমাত্মা হইতে জীবাত্মাতে নিঃশ্বসিত হয়, জীবাত্মা হইতে অন্য জীবাত্মাতে সঞ্চারিত হয়; এবং বিষয়-রাশির মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহারদিগকে আত্মার অধীনে আনয়ন করে। প্রজ্ঞার প্রভাবই আমারদের স্বাধীনতার নিদান-স্বরূপ; এবং স্বীয় মহতী প্রজ্ঞার প্রভাব দ্বারাই পরমাত্মা আমারদের মন হরণ করিয়া, সার্ব্ব-ভৌমিক সুশৃঙ্খলার অধীনে—শান্তি, মুক্তি ও মঙ্গলের অধীনে—আপনারই অধীনে—আমারদিগকে দিন দিন আহ্বান করিতেছেন। অতএব প্রজ্ঞা জড়বৎ অকর্ম্মণ্য নহে—উহা ব্রহ্ম-তেজে বলী হইয়া, উৎসাহে পূর্ণ হইয়া, যখন কার্য্যে পরিস্ফুট হয়; তখন প্রভুর কর্ত্তৃত্বে যেমন দাসের কর্ত্তৃত্ব, অথবা সেনাপতির কর্ত্তৃত্বে যেমন সেনার কর্ত্তৃত্ব, সেই রূপ একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্বে আমারদের আপনারদেরই কর্ত্তৃত্ব জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে। সকল বস্তুই ঈশ্বরের অধীন; কিন্তু প্রজ্ঞার প্রভাবে আমরা স্বাধীন-রূপে জ্ঞান ইচ্ছা ও প্রীতিসহকারে ঈশ্বরের অধীন হইতে সমর্থ হইয়াছি।

প্রজ্ঞা-ঘটিত মূল-তত্ত্বগুলিকে নিম্নে লতাবদ্ধ করা গেল।

পরমাত্মা	জগৎ	সম্বন্ধ-মূলক প্রজ্ঞা
অদ্বৈত	দ্বৈত-সাপেক্ষ	সার্ব্বভৌমিক
পূর্ণ	অপূর্ণ	উন্নতিশীল
মূলাধার	আশ্রিত	প্রভাবময়

সংস্কৃত সাহিত্য।

২৭৫ সংখ্যক পত্রিকার ৬১ পৃষ্ঠার পর।

মহাবীর আলেকজান্দরের ভারতবর্ষ আক্রমণের পর গ্রিশিয়েরা যখন ভারতবর্ষীয়দিগের সহিত সম্যক্ পরিচিত হইয়াছিলেন, তখন ভারতবর্ষীয়দিগের পূর্ব্বোল্লিখিত রূপই অবস্থা ছিল। ইতিবৃত্তবিৎ মহাত্মা মেগাস্থিনিস্ কহেন যে ঐ সময় ভারতবর্ষীয় হিন্দুরা মনুষ্যের জীবন ও মৃত্যুর বিষয়েই সমধিক আন্দোলন করিতেন। তাঁহারা এই জীবনকে গর্ভস্থ ভ্রূণের জীবনের ন্যায় অনুমান করিতেন এবং যাঁহারা মৃত্যু বি-